লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ

ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার
এম. এ, পি-এইচ. ডি
অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়
কোচবিহার

অনিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রয়াত অতুলচন্দ্র দে সরকার
শ্রীমতী ইন্দুমতী দে সরকার
বাবা ও মা
শ্রীচরণেষু

"দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি কুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ নিবেদন ॥

দেশের বিপুল মানুষের প্রায় শতকরা আশি ভাগ বাস করে গ্রামে। দেশের ভোগ্যপণ্যের শতকরা আশি ভাগ দিচ্ছে এই গ্রাম, আর জাতীয় আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসে গ্রাম থেকে। সমস্ত ভারতবর্ষেই এই গ্রাম উপেক্ষিত। উপেক্ষিত গ্রাম-দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

স্বাধীনতার বিগত ৩৪ বছরের অবাধ-মৃগয়ায় গ্রাম আজ হৃতশ্রী। গ্রামের অবারিত মাঠ আজও গগণ ললাটকে চুম্বন করে পরম আদরে, কিন্তু তা যেন অন্নহীনের সোহাগ চুমো উপোস করা প্রিয়ার মুখে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের গ্রামগুলো এ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

শহরের অবজ্ঞাকে বুকে নিয়ে মহাজন, ফরিয়া, দালাল, সরকারী কর্মী, শিক্ষক, চাষী, ক্ষেতমজুর, ঘাটিয়াল, হাটিয়াল, কবিরাজ, ওঝা, গায়েন, বায়েন, ফেরিওয়ালা, কাঁচের চুড়ি, কবিগান, ভাওয়াইয়া— এই সব নিয়েই তার দিন যাপনের গ্লানি আর প্রাণ ধারণের ক্লান্তিকর ইতিহাস।

এ গ্রন্থ কোন তত্ত্বজ্ঞানীর বিবরণ নয়। উত্তরবঙ্গের মানুষ হিসাবে দীর্ঘ পরিচয়ে কান পেতে শুনেছি এই অঞ্চলের লোকসংগীত সুধা, চোখ মেলে দেখেছি পাল-পার্বণ, অনুভব করেছি লোক-সাহিত্যের ছন্দিত প্রতিবিম্ব লোকায়ত দর্পণে।

যা অনুভব করেছি তথ্য ও সত্যকে অবিকৃত রেখে ভক্তির সাথে তাই নিবেদন করেছি। উত্তরবঙ্গের পল্লী প্রকৃতিতে শুধু ধানই জন্মায় না, জেগে ওঠে প্রাণ আর গানও।

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে এমন প্রচেষ্টা এর আগে দেখা যায় নি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে ব্যাপক অর্থে গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই উপরিসৌধ একথা আমরা আজ ভুলতে বসেছি।

প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও “আকাশবাণী”র অনুরোধে রচিত; প্রচারিত ও প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি

প্রান্তর নিয়ে তার লোকজীবন ও লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হোক এমনই কামনা করি।

প্রবন্ধ বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য মনে করি, কেননা তারা নিজেরাই কথা বলবে। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় এই গ্রন্থ রচনার প্রধান উৎসাহ দাতা। জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রীনলিনীকান্ত দে সরকার ও আমার অগ্রজ শ্রীঅজিতকুমার দে সরকার মূল্যবান্ উপদেশ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। নিছক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এ ঋণ পরিশোধ্য নয়। প্রেস কপি তৈরী ও অলংকরণে সাহায্য করেছেন সাহিত্য-বন্ধু শ্রীসুবোধ সেন ও ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল।

সরকারী অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক ছাপা সম্ভব হলো বলে কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থে যে সব নতুন ও মৌলিক মূল্যায়ণ স্থান পেয়েছে তার দায় আমার। উত্তরবঙ্গের এককালের প্রাণ-কেন্দ্র কোচবিহারের প্রতি একটু বেশী পক্ষপাত আমার সজ্ঞান প্রসূত। নিবারণ পণ্ডিত সমগ্র বাংলারই গণকবি। কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে তিনি উত্তরবঙ্গেরই মানুষ— আমি এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চাই নি।

অণিমা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীদ্বিজদাস কর আমাকে প্রীতিবদ্ধ করেছেন।

বিনীত—
দিগ্বিজয় দে সরকার

“অতুল ভবন”
পোঃ রাজারহাট
কোচবিহার

বিষয় সূচী

উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য-শব্দ ভাণ্ডার

প্রকৃত বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ চাই— এই দাবী পুরানো কিন্তু তা আজও অপূরণীয় রয়ে গেছে। বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভারের প্রতি প্রথম মনোযোগী হন বিদেশী ইংরেজী শাসকগণ। সিবিলিয়ান ফষ্টর সাহেবের ২০ হাজার শব্দের সংগ্রহ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমানের বেশ কিছু শব্দ সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ জেলাভিত্তিক শব্দ সংগ্রহের এটাই প্রথম স্বদেশী প্রচেষ্টা। স্থানীয় শব্দ-বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর "বাঙ্গালা ভাষা" অভিধানে ও রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ তাঁর "বঙ্গীয় শব্দ সিন্ধু" অভিধানে কিছুটা গুরুত্ব সহকারে গ্রাম্য-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু সে আলোচনাও অসম্পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক পৃথক ভাবে গ্রাম্য-শব্দ সংগ্রহ প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও কর্মকাণ্ড এ ব্যাপারে দরকার তা উভয় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। ব্যাপক জনগণের মধ্য থেকে তাদের মুখের যথার্থ কথাটি তুলে আনতে চাই প্রচুর জনবল, অর্থ, সর্বোপরি অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠা। তাড়াতাড়ি একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দেবার প্রলোভন এক্ষেত্রে সর্বনাশা ও তা বিকলাংগ হতে বাধ্য।

পাঁচটি জেলা নিয়ে বর্তমান উত্তরবঙ্গ। তার এই ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরেও গোয়ালপাড়া, কামরূপের একাংশে, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের সংলগ্ন বিহারের কিছু অংশে, বাংলাদেশের রংপুরের বেশ কিছু অংশে বাংলা ভাষার বিশেষ এক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। স্থান ভেদে এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য আরও বেশী। আমাদের গ্রাম প্রধান সভ্যতায় গ্রাম্য-শব্দের এক বিরাট ভাণ্ডার সর্বত্রই সুবিচারের প্রার্থী হয়ে রয়েছে তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে। এই দৈন্য ততদিন ঘুচবে না যতদিন বাংলা ভাষাভাষী সব অঞ্চলের কথ্য তথা "গ্রাম্য" নামধারী শব্দগুলোকে সংগ্রহ করে প্রকাশ না করা যাবে।

গ্রাম্য-শব্দ আসলে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। এ শব্দ স্বদেশী হতে পারে, বিদেশী হতে পারে, সংস্কৃত হতে পারে, হতে পারে প্রাকৃত। এই শব্দ আজ উপেক্ষিত, অনাদৃত নাম না জানা বনফুলের মত কবি-সাহিত্যিকদের অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত। অথচ এই সব শব্দেই গ্রামীণ জনসাধারণ তাঁদের মান-অভিমান, হাসি-কান্নার নিত্য লীলার অভিনয় করে যাচ্ছেন।

গ্রাম্য-শব্দের ব্যবহার সাহিত্যে হয়ে আসছে বাংলা সাহিত্যের জন্ম-লগ্ন থেকেই। এটা কবি সাহিত্যিকদের গ্রাম্য-শব্দের প্রতি কৃপা প্রদর্শন নয়। ভাবকে যথাযথ প্রকাশের মাধ্যম দিতে হলে চাই গ্রাম্য-শব্দের বেগবান অশ্ব। বাংলা ভাষার প্রাণাবেগ ও ঐশ্বর্য বহু গুণে বেড়ে যাবে যদি আমাদের লেখকগণ গ্রামীণ জীবন থেকে কাহিনী ও শব্দ গ্রহণের পরিশ্রম হাসি মুখে মেনে নেন।

গ্রাম্য-শব্দের ব্যবহার আমাদের মনের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে সহজেই উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ নেয়া যাক :—

চর্যাপদে : 'তুহিল দুধু কি **বেণ্টে** সামায়।'

গোপীচন্দ্রের গীত : '**গম্ভীরায়** বসি যোগী ধ্যানে দিল মন।'

এন্টুনি কবিয়াল : 'আমি জাত-ফিরিঙ্গী **জবড়জঙ্গী** পারব নাকো তরাতে।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণ : 'ভরতে দেখিয়া রাম তুলিল **কাঁকালি**।'

কোচবিহারের পল্লীগীতি : '**আইলত** ফুটে আইল কাশিয়া **দোলাত** ফুটে হোলা।'

উত্তরবঙ্গের প্রবাদ : 'একে পাতে খাই
তোর ক্যানে গাও **ডুমডুম**
মোর ক্যানে নাই ?

উত্তরবঙ্গের হেঁয়ালী : 'হিত্তি গেনু হুত্তি গেনু, গেনু মরাঘাট
আপন চোখে দেখি আসিনু ফলের উপর পাত।'

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে গ্রাম্য-শব্দগুলোর প্রভাব ও দক্ষতা ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক হয়েছে। উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য শব্দ-সম্ভারের ঐশ্বর্য যদি কেউ দেখতে চান তবে তাকে "গোপীচন্দ্রের গীত", "জংনামা"র দ্বারস্থ হতে বলি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এমন কি বিভিন্ন স্থানে একই শব্দের উচ্চারণ ভেদ লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী ও পুরুষের উচ্চারণেও রয়েছে বিভিন্নতা।

গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উত্তরবঙ্গে প্রচলিত গ্রাম্য-শব্দগুলোর কিছু পরিচয় নেয়া যাক।

কৃষি সম্পর্কিত : নাঙগল, জোঙগাল, কাঁচি (কাইচি), ইস, গাতি, দোলা (নীচু জমি), ডাঙ্গা, আইল, বিত্তি (আশু ধান), বোয়া (বুনে দেয়া ধান), রোয়া (রোপন করা ধান), বাথান (আবাস : মহিষবাথান), কুশিয়ার (আখ), বাদা (জঙ্গলা), সামগাইন (উদূখল), জলি (বরো ধান)।

তুলনীয় শিবের বিয়াও গান : 'মাটাও মাটাও কুশিয়ার ভাঙ্গি খায়' (মট্‌মট্‌ করে আখ ভেঙ্গে খায়)।

জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক বস্তু : পারো (পায়রা), বিলাই (বিড়াল), বাগ, হাত্তি, দামড়া (বলদ), দামড়ী, ডিগি (পুকুর), কোকিলা, জোনাক (জ্যোৎস্না), টিয়া, ময়না, চেকচেকিয়া, গাঙুরিয়া, সার (সারস), কোড়া, কুড়ী, বালিহাঁস, সুরজ (সূর্য), সানি (টোটো ভাষায় অর্থ সূর্য), খোলা (নদী— টোটো ভাষায়), গচ্ (গাছ), ধাত্তি (ধরিত্রী), চান্দ (চাঁদ), বান (বন্যা)।

তুলনীয় লোকগীতি : "কোড়া কান্দে কুড়ি কান্দে কান্দে বালিহাঁস
বনের হরিণী কান্দে ছাড়ি মুখের গ্রাস।"

তুলনীয় কোন বিয়ের উপহারপত্র : "আইসোরে পাখীগুলো
জয়গান যে ধর

টিয়া, ময়না, চেকচেকিয়া
গাণ্ডুরিয়া সার।”

দেবতা ও অপদেবতা : ঠাকুর, দেওতা, ভাণ্ডানী (বনদুর্গা), মাশান, ঈশ্‌পা (ভগবান— টোটো ভাষায়), গাঁও বুড়া (শিব) ইত্যাদি।

বয়ন ও অলংকার : টানা, মাকু, চরকি, সোন্না, নাকফুল, টিক্‌, বাক্‌খারু, বাজু, মাছিপাত, মাক্‌রি, নোলক, মটর, বাউটি, খারু।

তুলনীয় লোকগীত : “নাক ড্যাংরার ব্যাটাটা, চোখ ড্যাংরার নাতীটা
মোক ভুলালু সতের খারু দিয়া।”

গ্রাম নাম : ঢ্যাংঢিংগুড়ি, ডোডেয়ার পার, ডুডুমারী, টেঙ্গনমারী ইত্যাদি।

ক্ষৌরকার ইত্যাদি : নাউয়া (নাপিত), ক্ষুর, সোন্না (সোন), চামচী (চামটা), কানখুস্কি ইত্যাদি।

তুলনীয় প্রবাদ : না জানে নাওয়া কাম।

মাছের নাম : ধুতরা (ছোট মাছ), উই (রুই), ভেদাই, শাটি, খলসা, চেংটি, শাল, কুরশা, বোয়ালি, বৈরালী ইত্যাদি।

তুলনীয় লেখক কর্তৃক সংগ্রহ করা “কানাই ধামালী” :—

“মাছ মারে ছাওয়াল কানাই রাধা গাঁথে হালি
এচিয়া বেচিয়া মারে কৈ সে মাগুর শোলী।”

ঘর : ভাণ্ডার ঘর, দেওতা ঘর, গোসাই ঘর, রান্দন ঘর, জল্‌টুঙ্গী ঘর।

ছেলেমেয়েদের নাম রাখার ক্ষেত্রে তাদের আকৃতি, জন্মকালীন আবহাওয়া, স্থান, কাল, এমন কি সন্তানের জননী-সম্প্রদায়ের মানসিক ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজ নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা।

এই শব্দগুলো যেন এক-একটি ধ্বনি চিত্র। শব্দের এই অন্তর্নিহিত ধ্বনি-ব্যঞ্জনা গ্রাম্য-শব্দের প্রাণের সম্পদ।

দোমাসু = সংক্রান্তিতে জন্ম যার
ঢ্যাপা = মোটা লোক/ছেলে

প্যাট ঢ্যাপড়া = পেট ফুলা যার
গাটিয়া = মোটা ও কিঞ্চিত খাটো
ছেপচাটা = তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত নাম
ছুয়াপাতু = তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত নাম (মৃত বৎসারা এই
নাম দেন ছেলেদের)

বেড়াকাটা, নেলভেলু, নেবপেটু, ভোদা, চিগা ইত্যাদি নাম ব্যবহৃত হয় তুচ্ছার্থে (যেমন 'কেষ্টা বেটাই চোর')। মৃতবৎসরা অপদেবতার দৃষ্টি এড়ানোর মানসিকতা নিয়ে অনেক সময় এই ধরনের নাম দেন।

জন্মকাল, মাস, অবস্থাভেদে নামের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাক :—
আমাসু = অমাবস্যায় জন্ম
পোহাতু, পোহাতী (স্ত্রী) = প্রভাতকালে জন্ম
সৈসাঞ্জু = সন্ধ্যায় জন্ম
সাকালু = সকালে জন্ম
সমারু = সোমবার জাতকের জন্ম। সামারী = স্ত্রী লিং
মঙ্গালু = জাতকের জন্ম মঙ্গলবার। মঙ্গলী = স্ত্রী লিং
শুকারু = জাতকের জন্ম শুক্রবার
বিষাদু = জাতকের জন্ম বৃহস্পতিবার। বিষারী = স্ত্রী লিং
বুধারু = জাতকের জন্ম বুধবার
শনারু = শনিবারে জন্ম

আবার নবজাতকের প্রকৃতি অনুসারে নাম দেয়া হয়, যেমন :—
কান্দুরা = কাঁদে বেশী যে জাতক। কান্দুরী = স্ত্রী লিং
কালকুটি = কাল মেয়ে
সেজামুতুরী = শয্যায় মূত্রত্যাগ করে যে মেয়ে
হাতি পাই = হাতির মত অর্থাৎ মোটা পা যুক্ত মেয়ে
চিরল দাঁতী = ধারালো অসমান দাঁত যে মেয়ের

মেয়েদের ক্ষেত্রে চোখের, নাকের, চুলের ও অবঅব সংস্থানের দিকে

গুরুত্ব দিয়ে উপরের নামগুলো রাখা হয়েছে।

আকালু=আকালের সময় জন্ম যার
জোনাকু=শুক্ল পক্ষে জন্ম যে জাতকের
বানাতু=বন্যার সময় জন্ম যার
ফরসা ছেলের নাম—ধনা, চান্দু, রূপা, চান্দুরা ইত্যাদি।
গর্ভিনী নারীকে বলা হয় 'পেটলী',
যুবতী বিধবাকে বলা হয় 'গাবুর আড়ি',
গর্ভবতী বিধবাকে বলা হয় 'ডেকুর আড়ি',
সধবা নারীকে বলা হয় 'সাজো আয়ো'।

বৃত্তি সূচক : মইশাল=মাহিষপালন বৃত্তি যার
ঘাসিয়ার=ঘাস কাটা বৃত্তি যার
বাঁশীয়ার=বাঁশীওয়ালা
আটিয়ানদার=আঁটি বাঁধা বৃত্তি যার
খাড়া ধরা=খাড়া ধরা বৃত্তি যার

এ ছাড়াও প্রচুর শব্দ রয়েছে যেগুলো বিশেষ অর্থে এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

আগুন অর্থে 'জুই' শব্দ
বুক বাঁধার কাপড় অর্থে 'ফোতা' শব্দ
রংগীন খাটো চাদর অর্থে 'মেখলা' শব্দ
রূপকথা অর্থে 'উক্‌কথা' শব্দ
দুগ্ধ অর্থে 'খাওদা' শব্দ
ক্ষীর জাতীয় খাদ্যার্থে 'সিধল' অথবা 'সিদল' শব্দ
'জাব্‌রা' শব্দ এঁটো বাসনপত্র সব এক সাথে রাখার পাত্র অর্থে
'কিরিয়া' শব্দ শ্রাদ্ধ অর্থে ইত্যাদি।

আত্মীয় ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে : ডাঙর আই (বড় রাণী), বাই (বোন), পিসু, বাপই (বাপ=পুত্র), জেঠো, শালপোইৎ, ভাউসানী (ভাসুর বৌ) ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে এই ধরনের বিচিত্র গ্রাম্য-শব্দ ভাণ্ডার অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' সেই কবির আহ্বানের প্রত্যাশায় অবলুপ্তির হাত হতে বাঁচতে চাইছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার কোন অভিমানী পল্লীবধূ যখন গেয়ে ওঠেন—

"আইলত ফুটে আইল কাশিয়া দোলাত ফুটে হোলা

বাপ মায়ে বেচেয়া খাইছে সোয়ামী পাগেলা।" —তখন এই অভাগীর ব্যথা বহিরাগত কোন ব্যক্তির মন সঠিক স্পর্শ করে না যতক্ষণ না "বাপ মায়ে বেচেয়া খাইছে" এই বাক্যাংশের অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হয়। দরিদ্র বাপ অর্থের বিনিময়ে আর এক হত দরিদ্রের কাছে আত্ম (কন্যা) বিক্রয় করে—এ এক করুণ সামাজিক অধঃপতনের চিত্র।

গ্রাম্য-শব্দ এই অনাস্বাদিত জগতে প্রবেশাধিকার দেয়। বাংলা ভাষাকে তখনই 'মোদের গরব মোদের আশা' বলা যাবে যখন দেখবো তার ভাষা-ভাণ্ডারের বাইরের প্রহরী না হয়ে গ্রাম্য-শব্দগুলো তার অন্তরের সম্পদ হয়ে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও গবেষণা প্রসঙ্গে

লোকসংস্কৃতি বলতে বুঝায় ব্যাপক মানুষের সংস্কৃতি। গ্রামীণ মানুষ এই সংস্কৃতিকে দীর্ঘ দিন থেকে লালন-পালন করে এসেছে। এই সংস্কৃতির মূলে রয়েছে আদিম মানুষের সমাজ। প্রাচীন লোকজীবনের বাণী বহন করে এই সংস্কৃতি একাধারে অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস হয়ে উঠেছে। একদিকে লোকসংস্কৃতি অতীতের মৌন ইতিহাস, অপরদিকে তা বর্তমানের মুখর কণ্ঠস্বর। লোকসংস্কৃতি তাই চলমান ইতিহাস। আমরা জানি কালে কালে রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে— কিন্তু জনজীবনের লোকায়ত উপাদানের ভেতর এ সবের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায় না। লোকজীবনের ছন্দে-গানে, আচারে বিচারে, প্রবাদে-প্রবচনে সব ইতিহাসই বিধৃত। এই দিক থেকে শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতির ভিত্তিই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি; যদিও 'অশিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতি' বলে কম ঘৃণা দেখায় নি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ লোকসংস্কৃতির প্রতি।

লোকসংস্কৃতির অধিকার সমাজের সকলের, তাই তার 'লোক' আখ্যা সার্থক। শ্রমবিভাগের ফল-স্বরূপ পরবর্তী কালে 'একক সৃষ্টির' ব্যাপারটা আরও পরবর্তী কালে 'Trade Mark'-এর বাণিজ্যিক কৌশলে এসেছে। আদিম সমাজের শুরুতে সব কিছুরই উপর ছিল সমষ্টির অধিকার। লোকসংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে একক মানুষের ভূমিকা অবশ্যই আছে কিন্তু তা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে, লোকসংস্কৃতির উপর ব্যাপক মানুষের অধিকার। লোকসংস্কৃতি মূলতঃ মানুষের জীবন-প্রক্রিয়া।

জনসমাজের এই চলমান ইতিহাসকে কোন সমাজ তাই উপেক্ষা করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। পাঠ্যসূচীতে ইতিহাস,

ভূগোলের পাশেই লোকশিল্প, সাহিত্য বা নৃত্যও পড়ানো হয় ঐ সব দেশগুলোতে।

আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও গবেষণার ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব পায় নি। গুরুসদয় দত্ত, ডঃ ভেরিয়ার এলউইন, আশুতোষ চিত্রশালা, সম্প্রতি ললিতকলা আকাদেমি লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সংগ্রহশালা স্থাপনের ব্যাপারে কিছুটা কাজ করেছেন। এ ছাড়া দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, লালবিহারী দে, বিনয় ঘোষ; সাম্প্রতিক কালে অরুণ রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও নিবারণ পণ্ডিত এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ কখনই তেমন প্রাধান্য পায় নি। বলা চলে, লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণের দিক থেকে আমাদের শৈশব অবস্থাটা এখনো কাটে নি। অতীতের এই ইতিহাস মনে রেখে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার কথা ভাবতে হবে।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় বিচিত্র জীবনযাত্রার এক বর্ণবহুল ছবি লোকসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

লোকসংস্কৃতির গুরুত্বকে উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকসংস্কৃতি উপদেষ্টা পর্ষদ্ গঠন করেছেন। এই পর্ষদের পরামর্শক্রমে ১৯৮০র মার্চ-এপ্রিল মাসে পুরুলিয়া, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতে তিনটি আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি উৎসব ও ওয়ার্কশপ হয়ে গেল। লোকসংস্কৃতির ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লোকশিল্পীদের (শিল্প ও শিল্পীকে) জানলেন আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে। লোকশিল্পীরা পারস্পরিক মেলামেশার ভেতর দিয়ে জানলেন লোকসংস্কৃতির বিচিত্র গতি প্রকৃতি। জলপাইগুড়ির উৎসবে রাভাদের অতি বৃহৎ নলের বাঁশীর সুরে সাঁওতাল মেয়েরা আনন্দে নাচলেন। নেপালী লোকশিল্পীরা গারো, মেচ, টোটো উপজাতীয় শিল্পীদের হাত ধরে গেয়ে উঠলেন আর

বৃত্তাকারে নাচতে লাগলেন। লোকসংস্কৃতির প্রাঙ্গণ ভিন্ন এমন প্রাণখোলা মিলন হয়তো সম্ভব ছিল না। লোকশিল্পীরা বললেন— এই নাচ-গান তাঁদের পরিশ্রমী জীবনের প্রেরণাস্বরূপ ; এ সব বেঁচে আছে, থাকবে। এই ধরনের মিলন-উৎসব শিল্পীদের আত্মবলে বলীয়ান করবে— এ প্রয়াস আগে কেউ করেন নি, এটা যেন চলতে থাকে।

উত্তরবঙ্গের বিচিত্র জাতি-উপজাতিগুলোর মূলগত ঐক্যের অনেক মূল্যবান উপাদান পাওয়া যাবে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ব্যাপক গবেষণা চালালে। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ও আর্থিক কারণে এই অঞ্চলে এসেছে অগণিত মানুষ। কি তাঁদের সঠিক পরিচয়, কি তাদের সঠিক ভাষা বা কোন উপজাতি থেকে তাঁরা কোন্ জাতিতে রূপ নিয়েছে বা নিচ্ছে এই সব উপাদান সংগ্রহ লোকসংস্কৃতির আওতায় আসবে। জাত-পাতের লড়াই, ভাষার হানাহানি অনেকাংশেই দূর হয়ে যাবে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে যদি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে সঠিক মূল্যায়ণ করা যায়। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে সাঁওতালরা। এই সাঁওতালদের একটা বড় অংশ জলপাইগুড়ি, পশ্চিমদিনাজপুর ও মালদহে থাকেন। বাংলা ভাষা ভাণ্ডারে 'অষ্ট্রিক' শব্দ প্রাধান্য বড় কম নয়। এই অষ্ট্রিক ভাষার প্রতিনিধি-স্থানীয় ভাষা হচ্ছে 'মুণ্ডারী'। এই মুণ্ডারী ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, জুয়াঙ প্রভৃতি উপজাতিসমূহ ব্যবহার করেন। এখন যদি কেউ বলেন ঐ সাঁওতাল উপজাতিই আজকের কুলীন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের আদি পুরুষ তবে তাকে উগ্র জাত-ভেদের মার খেতে হতে পারে ; কিন্তু তথ্যটা তো অভ্রান্ত। বাংলা ভাষা ও বাঙালীদের দেহের দীর্ঘতা, মাথার আকার, নাক ও মুখের গঠন, চোখ ও চুলের রং অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এই সত্যের দিকেই নিয়ে যাবে। লোক-ভাষার চর্চা বলবে —অষ্ট্রিক ভাষা আদি-অস্ত্রাল জাতিসমূহের ভাষা ও তা দ্রাবিড়দের পূর্ববর্তী। এই আদি অস্ত্রালরা (Proto-Australoid) কিরাত,

শাবর ও অরণ্যচারী হয়ে আজও বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে।

আদি অস্ত্রাল জাতির সঙ্গে পামির ও তাকলামাকান মরু অঞ্চল থেকে আগত বিস্তৃত-শিরস্ক 'আলপাইন' জাতির সংমিশ্রণেই বাঙালীর বর্তমান অবস্থান। এই পরিচয় মৈত্রীর সহায়ক।

মুসলমান সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক। লৌকিক দেবদেবীর পরিচয় নিলে সত্যপীর, ওলাবিবি, বিবিমা, বনবিবি ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই দেবতা বলে চিহ্নিত হবে। উত্তরবঙ্গের মদনকামের গানে "হায় আল্লা" পদ আছে। অথচ মদনকাম হিন্দুদের দেবতা। এতে চমকে যাবার মত কিছুই নেই। লোকসংস্কৃতির সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় পনের আনাই হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। বহিরাগত আগন্তুক কিছু মুসলমান কোন কোন অঞ্চলে (যেমন চট্টগ্রামে ও তৎকালীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও গৌড়ের কাছে) ছিলেন নিতান্ত অল্প সংখ্যায়। বাঙলার মুসলমানদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ই বলবে তাঁরা এই দেশেরই আদি মানুষ অর্থাৎ জন্মসূত্রে এরাও আদি-অস্ত্রাল-এর অংশমাত্র।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে লোকসংস্কৃতি মানুষের জাতপাতের বড়াই অনেকটাই কমাতে পারবে— ভুলিয়ে দিতে পারবে বিভেদের বিষবাষ্পকে।

লোকসংস্কৃতি শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস বহন করে, তাই বিভেদের ব্যবসায়ীরা পণ্ডিত নামধারী দালালদের অথবা দুই নম্বর ভাঁড়দের নিযুক্ত করেছে সর্বত্র। এদের কাজ হচ্ছে কালের গতিকে উল্টো দিকে উজানে টেনে নেয়া। সর্বত্র এদের কাজ হচ্ছে এই কথা বলা যে অমুক উপজাতি সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সবচেয়ে আদিম অথবা তমুক উপজাতিদের জন্য এই এই পৃথক ব্যবস্থা দরকার যেন ওরা অভয়ারণ্যের কোন বিশেষ জাতের পশু। কিন্তু বৃহত্তর কোন বলয়ের মানুষ ঐ উপজাতি বা তাদের ভাষা মূল কোন ভাষাকে কী ভাবে সমৃদ্ধ করছে

বা জন-সমুদ্রে ঐ জাতি কিভাবে লীণ হচ্ছে এসব পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি এদের কাছে মিলবে না। কারণ, লোকসংস্কৃতির নামে এরা চায় মানুষে মানুষে বিভেদ, সংস্কৃতি সংস্কৃতিতে বিভেদ। উত্তরবঙ্গেও এই ধরনের গবেষক এখন গজাবে ঐতিহাসিক কারণেই।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় বসতি করে বিভিন্ন বর্ণের হিন্দু, মুসলমান; এছাড়া আছে লেপচা, মেচ, ভুটিয়া, রাভা, গারো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, ম্রু, নেপালী, লিম্বু, মুর্মী, টোটো প্রভৃতি উপজাতির জনসমাজ। এত কম বিস্তারে এত বেশী বিভিন্নতা বাংলা দেশের অন্যত্র দেখা যায় না। উত্তরবঙ্গে তাই লোকসংস্কৃতির চর্চাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। বিভিন্ন জনজাতির ভাষার ইতিহাস, জাতির ইতিবৃত্ত এই সবের সঠিক মূল্যায়ন হলে দেখা যাবে জাতি ও ভাষার বিভেদ অনেক কমে যাবে— সাধারণ একই সত্যের উপর একই সঙ্গে অনেককে দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

বিদেশী মিশনারীরা উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের দরিদ্র আদিবাসীগণকে নানাভাবে প্রলোভিত করছে, ধর্মান্তরিত করছে। নানা মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে। বিভেদ সৃষ্টির এই অপচেষ্টা দ্রুত বন্ধ হওয়া দরকার।

লোকসংস্কৃতির উপাদান ও তথ্যসংগ্রহ এবং তা সংগ্রহশালার জন্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা যথেষ্ট কঠিন বিষয়। দক্ষ ও অভিজ্ঞ গবেষকদের অক্লান্ত শ্রমের ও নিষ্ঠার বিনিময়েই এটা করা সম্ভব। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির যেসব উপাদান সংগ্রহ করা উচিত বলে মনে হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল :—

(ক) লোক কাহিনী : পৌরাণিক কাহিনী ও ঐতিহাসিক কাহিনী। যেমন খেনরাজা, নলরাজা, দেবী চৌধুরানীর কাহিনী।

(খ) লোক নাম : গ্রাম নাম, নদীর নাম আর এ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী। এই সব নামের অন্তরালে থাকে ভাষা ও জাতির ইতিহাস (দ্রষ্টব্য —লেখকের "কোচবিহারের গ্রাম নামে সমাজ চিত্র")।

(গ) পাল-পার্বণের ইতিহাস : যেমন তিস্তাবুড়ি পূজা, বুড়া ঠাকুরের পূজা, সোনা রায়ের পূজা, মদনকামের পূজা ইত্যাদি পূজা, পার্বণ ও মেলার ইতিবৃত্ত।

(ঘ) লোক শিল্প : মনসার পট, শোলার কাজ, মুখোশ, বাঁশ ও বেতের নানা প্রকারের শিল্প কর্মের সংগ্রহ।

(ঙ) লোক নৃত্য : মুখা নাচ, গম্ভীরা নাচ, হুদুমদেও নাচ, থালি নাচ, ডাস্কু নাচ, বাউদিয়া নাচ, বাণ নৃত্য প্রভৃতি নৃত্যকলার কৌশল, জনপ্রিয়তা ও সৌন্দর্য সংক্রান্ত তথ্য।

(চ) ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন : জনজীবনের অনেক তথ্য তাদের ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচনে মিলবে। এগুলো সংগ্রহ করে, ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করলে দেখা যাবে ধনী-দরিদ্রের সামাজিক অবস্থান, সমাজ জীবনে কৃষক শ্রমিকের স্থান, মা-বাবা-প্রতিবেশীর চরিত্র ইত্যাদি সুন্দর ফুটে উঠছে।

(ছ) গ্রামীণ শব্দ ও লোকভাষা : এই ক্ষেত্রটি ব্যাপক ও বিশাল। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় প্রচলিত গ্রাম্য-শব্দগুলো তালিকাবদ্ধ করে প্রকাশ করতে পারলে বাংলা ভাষায় তা আরো বেশী গতি সঞ্চার করবে। উত্তরবঙ্গে ছোট ছোট জনজাতির অনেকের ভাষাই একটা মিশ্র ভাষা। এই মিশ্রণের স্বরূপ বের করতে হবে।

(জ) লোকসঙ্গীত : উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, নীলের গান, জাগের গান, জং-এর গান, মইষাল ও মাহুতবন্ধুর গান, নেপালী বিভিন্ন লোকসঙ্গীত, দেহতত্ত্বের গান, জারি গান, সৈত্তপীরের গান, ভাটিয়ালী, বিভিন্ন উপজাতিদের সঙ্গীত সংগ্রহ করে তার প্রামাণ্য রূপ প্রকাশ করতে হবে। লোকসঙ্গীতের সুরভাণ্ডার ভবিষ্যৎ সঙ্গীত সাধকদের কাজে আসবে।

(ঝ) লোকনাট্য : বিভিন্ন লোকনাটক ও পালাগান সংগ্রহ করে ওগুলো প্রকাশ করতে হবে। গীতিকা পাওয়া গেলে সংগ্রহ করতে হবে। মালদহের 'গম্ভীরা পালা', জলপাইগুড়ির 'আলকাপ',

পশ্চিমদিনাজপুরের 'খন গান', কোচবিহারের 'কুষাণ', 'বিষহরি' পালাগানগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করতে গেলে গ্রহণ করতে হবে গ্রাম-সমীক্ষা পদ্ধতি। সমীক্ষক নিকট আত্মীয়ের মত গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশবেন, এতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজ হবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুইভাবে সমীক্ষা চালানো যায়। সংগ্রহ করা উপাদান আবার যথাযোগ্য ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ কাজে যান্ত্রিক কারিগরী সহযোগিতা দরকার হবে। কোন্ উদ্দেশ্যে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে তা আগে থেকে ভালভাবে বুঝে নেয়া চাই। বিশেষ ভাবে প্রশ্নমালা তৈরী করে সমীক্ষণীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে জেনে নিতে হবে। তাই সমীক্ষককে হতে হবে একাধারে সমাজ-সংস্কৃতি বিজ্ঞানী। সমীক্ষার বিষয়গুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ—

(ক) গ্রামনাম— ইতিহাস, গ্রামের প্রাচীনত্ব, আয়তন, জেলাগত পরিচয়।

(খ) গ্রামের ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ— নদীনালা, জলসেচ ইত্যাদি।

(গ) জনশিক্ষা— স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, জন্মহার, শিক্ষালয়।

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি— উৎপন্ন ফসল, হাট-বাজার ইত্যাদি।

(ঙ) পেশা— কৃষিতে, চাকুরীতে, কি কি চাকুরীতে নিযুক্ত, কৃষি পরিবারের আয়তন, ক্ষুদ্র চাষী, বড় চাষী, প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা, কৃষিজীবী শ্রমিক ও ভূমিহীন মানুষের পরিচয়।

(চ) গ্রামীণ মানুষের পাল-পার্বণ— বিবাহপ্রথা, জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত আচার-বিচার, মন্দির বা দেবস্থানের বিবরণ।

(ছ) উৎসব ও মেলা— গ্রামীণ মানুষের জীবনে এর প্রভাবের স্বরূপ— দেবদেবীর কথা।

(জ) গান-নাচ-নাটক— অবসর বিনোদন, কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(ঝ) ভাষা— স্থানীয় ভাষার স্বরূপ, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও ছড়া সংগ্রহ।

(ঞ) অর্থনৈতিক জীবন— অর্থনৈতিক পরিবর্তন কী ভাবে লোক জীবনকে প্রভাবিত করছে— কী করে পুরানো বিশ্বাস ভাঙছে— সামগ্রিক ভাবে সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র।

শুধু উত্তরবঙ্গে নয় এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গেই শুরু করা দরকার। লোকসংস্কৃতির উপর যত্নবান হওয়ার অর্থ সামাজিক সুসম্পর্ককে আরও দৃঢ় করা। অপসংস্কৃতির খলনায়কেরা যখন বিশ্ব জুড়ে তাণ্ডব শুরু করেছে তখন সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাই এই প্রেত নৃত্যকে বন্ধ করে উন্নত জীবনের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে পারে।

উত্তরবঙ্গের বনশ্রী

বন মানেই বনের রাজা বাঘ। বন মানেই কাকর-চিতল-হরিণ। বন মানেই নির্জন পাহাড় আর মুখর ঝর্ণা। বন মানেই আদিবাসী, অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনযাত্রা। বন মানেই বিদেশী পর্যটক আর বিদেশী মুদ্রা। বন মানেই ছুটির খুশীতে মোহিনী মায়ার হাতছানিতে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ক'দিনের জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া।

উত্তরবঙ্গের বনে বনেও সেই একই আকর্ষণ। "অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্য মধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদ শূন্য, ছিদ্র শূন্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনের তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখনও মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্মর এবং বন্য পশু-পক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।" —উত্তর বঙ্গের অরণ্য পটভূমিকায় রচিত "আনন্দমঠ" উপন্যাসের উপক্রমণিকার কথা নিশ্চয়ই ভুলবার নয়।

পশ্চিমবঙ্গের ১২০০০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চলের ৩০০০ বর্গ কি. মি. বন রয়েছে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায়। এর মাঝে আবার জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিং-এর অরণ্য-সমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। জেলাওয়ারি হিসেবটা এই রকম—

দার্জিলিং-এর আয়তন ৩০৭৫ বর্গ কি. মি., বনাঞ্চল ১২৮৩ বর্গ কি. মি.।

জলপাইগুড়ির আয়তন ৬২৪৫ বর্গ কি. মি., বনাঞ্চল ১৭২৬ বর্গ কি. মি.।

কোচবিহারের আয়তন ৩৩৮৬ বর্গ কি. মি., বনাঞ্চল ৫৭ বর্গ কি. মি.।

মালদহের আয়তন ৩৭১১ বর্গ কি. মি., বনাঞ্চল ১৪ বর্গ কি. মি.।

পশ্চিমদিনাজপুরের আয়তন ৫২০৬ বর্গ কি. মি., বনাঞ্চল ১৩ বর্গ কি. মি.।

এই হিসাব থেকে এটা স্পষ্ট যে দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ির অরণ্যের হার মোট জমির যথাক্রমে ৪১·৭২ ও ২৭·৬৪ শতাংশ।

উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল বলতে তাহলে বোঝাচ্ছে দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ির বনকে। এ দুটি জেলায় যে বন-সম্পদ দাঁড়ানো রয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি কিউবিক মিটার; জঙ্গলে দাঁড়ানো অবস্থায় যার দাম কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা। বন থেকে যে সম্পদ প্রতি বছর আহরণ করা হচ্ছে তার মূল্য ৭ কোটি টাকা। প্রায় সমতলভূমি থেকে শুরু করে পাহাড়ী জমির ৮ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই বনভূমির বিশাল বিস্তার। দার্জিলিং-এ এর নাম তরাই আর জলপাইগুড়িতে এর নাম ডুয়ার্স। কত যে গাছ, কত না নাম। শাল তো আছেই, আছে ওক, পাইন, ফার, দেবদারু, সেগুন, শিশু, শিমূল, চাপ, চিকরাসি, বার্চ; আছে পাণিসাজ, গামার, ধুপী। আর সে বন আজও অত্যন্ত ঘন, সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ বহু স্থানে। ঘন অরণ্যে কোন আগন্তুক এসে শুনতে পাবে অরণ্যের কানাকানি, যেন বলছে—পৃথিবীতে প্রাণের অগ্রদূত আমরা, আমরা বাঁচবো, আমরা থাকবো। বন কেটে বসতি তৈরী করে উৎখাত করো না আমাদের; গাছে কুড়োল মেরে নিজেরা খঞ্জ হয়ো না, সাহারাকে করো না বিস্তৃত।

উত্তরবঙ্গের বুক চিড়ে চলে গেছে পাহাড়ী নদীরা—তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, ডায়না আরো ছোট-বড় প্রচুর নদী আর ঝোরা বা ঝর্ণা। ছোট-বড় পাথরকে নাচিয়ে দিয়ে অরণ্যে পর্বতে ওরা পথ করে চলেছে। সকাল সন্ধ্যায় জল খেতে এসে নদীর দর্পণে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে

মুগ্ধ হয় সম্বর, চিতল, হরিণ, বুনোমোষ আর বাঘেরা ; যাদের সংখ্যা উত্তরের এই বনাঞ্চলে নগণ্য নয়।

সেভোক রোডের ঐ বিখ্যাত Coronation সেতুর উপর দাঁড়িয়ে ভয়ংকরী তিস্তার রুদ্র মূর্তি যে দেখেছে তার জীবন সার্থক। "ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের উপর— স্রোতে আবর্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে— সেখানে একটু চিকিমিকি ; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে— গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার— অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা তীব্র স্রোতে চলিতেছে ; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে— আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে।"— বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের ত্রিস্রোতার [তিস্তা] এই বর্ণনা কাব্যিক উচ্ছ্বাস মাত্র যে নয় যে কোন নগর সভ্যতায় লালিত মানুষ কালাঝোরার তিস্তা দেখে এ কথা স্বীকার করবেন।

উত্তরবঙ্গের বনশ্রীকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে এখানকার চা-বাগিচাগুলো। চা-শিল্প নির্ভর মানুষের জীবনযাত্রা চলেছে অরণ্য-আদিম জীবনের পাশে পাশে। কাঠ ও চা এই দুই ফসলে এই অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের দিন যাপনের ইতিহাস। মদেশীয়া, মেচ, সাঁওতাল, গারো, রাভা, ভুটিয়া, লেপচা এদের জীবন আবর্তিত হচ্ছে বনকে কেন্দ্র করে।

ভ্রমণ রসিক পর্যটকদের কাছে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল আকর্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের অভয়ারণ্যের তুলনায় উত্তরের অভয়ারণ্য-গুলো নানা কারণেই উন্নত। সহজেই বন্য পশুর সাক্ষাৎ এগুলোর আকর্ষণের অন্যতম কারণ। পর্যটকদের জেনে রাখা ভাল যে, উত্তরবঙ্গে পাঁচটি অভয়ারণ্য আছে। জলপাইগুড়িতে আছে চাপড়ামারী, গরুমারা,

জলদাপাড়া— এই তিনটি অভয়ারণ্য ; যাদের আয়তন যথাক্রমে ৮·৮১, ৮·৬২ ও ৯৩·২৪ বর্গ কি. মি.। দার্জিলিং-এ আছে দুটি অভয়ারণ্য— সিঞ্চল ও মহানদী, যাদের আয়তন যথাক্রমে ৩৯·৬৫ ও ১২৭·২২ বর্গ কিলোমিটার।

ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে অনেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং যান ; এখন যাবেন মিরিকে যেখানে আছে কৃত্রিম হ্রদ ও তার উপরে সাঁকো, পাইন বনের সমারোহ চলেছে সীমাহীন উধাও দিগন্তে।

দার্জিলিং এলে সিঞ্চল হ্রদ ও অভয়ারণ্য দেখতে ভুলবেন না যেন। এই হ্রদ থেকে শহরের পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। ঘুম থেকে সামান্য উপরেই এই অভয়ারণ্য। এপ্রিল, মে অথবা অক্টোবর বা নভেম্বরে আসুন। এখানে আছে হিমালয়ান ভাল্লুক, বিভিন্ন ধরনের পাখী আর কাকর-হরিণ। বন বিভাগের ডাকবাংলোতে ঠাঁই পেতে অসুবিধা নেই। বন বিভাগের হুকুম নিয়ে কালীঝোরার বাংলোতে উঠতে পারেন। কালীঝোরার বাংলো P.W.D. ও Forest Dept.-এর যৌথ সম্পত্তি। এই বাংলো এখন সিনেমার চিত্র গ্রহণের জন্য প্রায়ই ভর্তি হয়ে যায়। মহানদী ও তিস্তা, এই মহানদী অভয়ারণ্যের বুক চিরে কী ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্যেরই না সৃষ্টি করেছে! বাঘ, হাতী, হরিণ, বানর, বুনো মহিষ, সম্বর, বনমুর্গী আর বিচিত্র বৃক্ষরাজি সুসজ্জিত এই অরণ্য গা ছমছমানো আদিম রহস্য নিয়ে ভ্রমণকারীকে অভ্যর্থনা জানাতে সদা সর্বদা তৈরী।

এবার চলুন ডুয়ার্সের গরুবাথান বলে একটা ছোট্ট শৈল নিবাসে। প্রায় একশত বছরের পুরানো এখানকার ডাকবাংলোতে পৌঁছতে মালবাজার থেকে লাগবে মাত্র ১৫ মিনিট। বুনো হাতী আর বাঘের দেখা পাওয়া যায় এখানে।

চাপড়ামারী রেল ষ্টেশনে (N. F. R'y.) নেমে যাওয়া যায় চাপড়ামারী অভয়ারণ্যে। চালসা থেকেও ঢুকতে পারেন এখানে। ছোট বন হলেও আপনি যদি অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মাঝে

এখানে আসেন তবে একশৃঙ্গী গণ্ডার ছাড়াও চিতা বাঘ, বাঘ, হাতী আর অসংখ্য পাখী দেখতে পাবেন।

গরুমারা অভয়ারণ্যে ঢুকে গেছে চার কিলোমিটারের একটি নুড়ি বিছানো রাস্তা ময়নাগুড়ি-চালসা রাস্তার বড় দীঘি মোড়ের ডান দিক দিয়ে। অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলে গেছে মূর্তি নদী। নদীর ধারের টাওয়ার থেকে বন্য জন্তু দেখা কঠিন কিছু নয়। এই স্বপ্নময় নির্জন পরিবেশে একটি দিন কাটাতে ভাল লাগবে।

শিলিগুড়ির ট্যুরিস্ট কাউন্টার থেকে অথবা জলপাইগুড়ির D.F.O.-র কাছ থেকে হুকুমনামা নিয়ে জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যের হলং ট্যুরিষ্ট লজে এসে উঠুন। মাদারাহাটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ হোষ্টেলে উঠতে পারেন। এখান থেকে হলং ৬ কি. মি.। বন বিভাগের হাতীতে উঠে বন-ভ্রমণ রমণীয়। বিখ্যাত একশৃঙ্গী গণ্ডার, পাখী, হাতী, বিভিন্ন জাতের হরিণ, বন্যবরাহ এখানে সংখ্যায় সুপ্রচুর।

উত্তরবঙ্গের বন দেয় অর্থ, দেয় আনন্দ। কুমারী রমণীর থমকানো চোখের নির্জনতা নিয়ে সে অপেক্ষারত। বনলক্ষ্মীর সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীর এই আত্মীয়তা সচরাচর দেখা যায় না। এই বনশ্রী তাই শুধু ছায়া নয়, মায়া নয়, ভাব-বিলাস নয়— উত্তরবঙ্গের জনজীবনের রমণীয় অঙ্গ, একাধারে প্রেম ও প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের হেটো কবিতায় সমাজচিত্র

আপনি কি কখনো গ্রামের হাটে গিয়েছেন? মলিন বসন, পায়ে ঘুঙুর, বাবড়ি চুল, কাঁধে ঝোলা— একটা লোক নেচে নেচে বিচিত্র সুরে কি যেন বলছে! ওকে ঘিরে লোকও জমেছে বিস্তর। কৌতূহলী হয়ে আপনি যদি একটু দাঁড়ান, তবে শুনতে পাবেন ঃ

'……মাথায় রঙিন ফিতা ২ কিলিপ আটা বেণী গাঁথা চুল
ভারা দিঘীর মাঝে যেমন ফোটে হোলার ফুল।
কন্যা রূপে ভোমরা………'

গোবরে পদ্মফুলের মত এ রূপের ফুল ফুটেছে দূর প্রান্তের কোন সে গাঁয়ে। 'হোলার ফুল' আর ভোমরার রূপকে বড় মনোরম ভাবে সে ফুলকে ফুটতে দেখেছেন কোন গ্রাম্য কবি। এ কবির লক্ষ্য অরূপ রতন নয়— কিঞ্চিত রূপা। এই কবিতা কুসুম তার পণ্য— চাল ডাল তেল-নুন আর দশটা জিনিষের মতই। যদিও কবিতার মূল্যে এদেশে কবি বাঁচে না, তথাপি কবিতাই এই বিচিত্রবেশী কবির জীবিকা।

এই সব হেটো কবিরা গ্রামের হাটে আজও কবিতা ফেরি করে বেড়ায়। কত কাঞ্চন কন্যার কত করুণ গাথা, সমাজজীবনের কত হানাহানি, নিষিদ্ধ প্রেমের কত না গুঞ্জন এঁদের কবিতায় ছন্দিত।

'ভালবাসার বিনিময়ে জীবন', 'বিয়ে নয় টাকা', 'জান্নাতের পথে', 'মামা ভাগ্নির বিয়ে', 'ইয়াহিয়ার দর্পচূর্ণ', 'গরীবি হটাও' ইত্যাদি বিষয় এই কবিদের কবিতায় স্থান পায়। গ্রাম-জীবনের তুচ্ছ বিষয়গুলোর সঙ্গে গভীর সমস্যামূলক ও বৃহত্তর সমাজজীবনের কত না সমস্যা ও অসঙ্গতি এঁদের উপজীব্য। এই সব গ্রাম্য কবির ঘরে চাল বাড়ন্ত কিন্তু সমাজজীবনের প্রতি বিশ্বস্ততায় এঁরা অদ্বিতীয়। রাজরোষ বা রাজকোষকে এঁরা আমল দেয় না। কোন সমালোচকের কলম

এঁদেরকে বিদ্ধ করে না। কোন সম্পাদকের সখের কলমচী এঁরা নন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের রহস্য এঁদের অজানা। সুপ্রাচীন কাল থেকে স্রোতস্বিনীর তরঙ্গ-হিল্লোলের মত, ভোরে গেয়ে ওঠা পাখীর কলকাকলির মত, সন্ধ্যার মৃদু মন্দ বায়ু-প্রবাহের মত এঁদের কবিতা।

সদ্য গোঁফ ওঠা কোন গ্রাম্য তরুণ এ কবিতা পড়তে পড়তে অজানা বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়, সদ্য শাড়ী ধরা গ্রাম্য কিশোরীর বুক করে উথাল-পাথাল। বুড়োরা গাল দেয়— 'বাওরা কবি'। কিন্তু কে বলবে, তাঁদের হারিয়ে যাওয়া সোনা-দিনগুলির কথা তাঁদের স্মরণে আসে কিনা!

এতক্ষণে হেটো কবির আসর জমে উঠেছে, বাড়ী ফেরার পথে গ্রাম্য যবক ছড়া আওড়াতে আওড়াতে যাচ্ছে ঃ

'মাগো বীণাপাণি বাগবাদিনী কবিত্বের সার
তোমারি চরণ বিনে কিছু নাই আর
দেখে কালের গতি রীতিনীতি ভেবে চিন্তে মরি
পুরাণ-কোরাণ কেউ মানে না ধর্ম গেল ছাড়ি।'

বন্দনার এই ভঙ্গিতেই এঁরা শুরু করে কবিতা। নাম কবিতা কিন্তু আসলে গাথা কবিতা; গান করার জন্যই লেখা পল্লী সঙ্গীতের এ নতুন জগৎ সভ্য সমাজে অনাদৃত হলেও গ্রাম্য-জীবনের নিপুণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এ যেন পটুয়ার পট, কথা দিয়ে আঁকা ঃ

'পায়ে আলতা পরা ২ যায় না চাওয়া চটি জুতা পায়,
হেলিয়া দুলিয়া পরে যৌবন জ্বালায়॥
বাহুতে চেইন অনন্ত ২ দেখতে শান্ত কোমরে চেইন দিয়া
হাইটা গেল দেখায় যেমন পরে বুঝি ভাঙ্গিয়া॥
পিন্‌ছে মিহি শাড়ী ২ পাছা পাইরে ঝিলিমিলি করে
আঁচলে ছোরাণি বান্ধা ঝুনুর ঝুনুর করে
মাথায় কালো কেশ ২ দেখতে বেশ ভ্রূ কপাল জোড়া
দেখলে রসিক ঠিক থাকে না পাগল হয় বুড়া॥'

বাইশ কান্দা গ্রামের অঞ্জলীর এই জীবন্ত ছবি এঁকেছেন কবি জুরানচন্দ্র সাহা। এই বর্ণনা পড়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছা করে : চঞ্চল কমলদল সদৃশ নয়ন যুগল যাহার— শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় আনন যাহার— যিনি মদমত্ত করি-শ্রেষ্ঠের মত অলসগমনা— কোন সুকৃতির ফলে বিধাতা সেই রমণীকে গড়িয়াছেন ?

'তরল কমল দল সরি-জুঅ-নঅনা
সরঅ-সমঅসসি-মুসরিস-বঅনা
নঅগল করিবর-সঅল সগমনী
কমণ সুকি অফল বিহি গড়ু রমণী।'

গ্রামের প্রস্ফুটিত এই সৌন্দর্য শহুরে কবির লেখায় ধরা দেয় না। এই সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয় পল্লী-জীবনের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অভাব। পল্লী কবি সেকথা বলতে ভোলেন না—

'কারো পেটে ভাত মিলে না ২ নেংটি তেনা অস্থি চর্মসার।
কিবা বড় কিবা ছোট লাগল চমৎকার ॥
কেউতো শান্তি পায় না ২ অভাব যায় না অর্থ চিন্তা মনে।
উপর আলা কেউ মানে না হিন্দু মুসলমানে ॥'

পণ প্রথার নিগড়ে বাঁধা সমাজ আজও মেয়ের বাপ-মার চোখের ঘুম কেড়ে নেয় :

'কত মেয়ে নিয়ে ২ দায় ঠেকিয়ে আছে ঘরে ঘরে।
হাজার টাকা পণ না দিলে ছেলে নাই সংসারে ॥
তারপর সাইকেল ঘড়ি ২ আংটি চুরি মেয়ের গলার হার।
বাসন পত্র এক পরস্থ আরও ট্রেঞ্জিস্টার ॥'

মাঝে মাঝে সরকারী কর্মচারীরা আসেন, অভাব মোচনের কথা বলেন, 'গরীবি হটাও' শ্লোগান দেন, কিন্তু অভাব ঘোচে না হটে যায় গরীব নিজেই। গ্রাম্য কবির আর্তনাদ শোনা যায় :

'হবে লোক নিয়ন্ত্রণ ২ সর্বক্ষণ খাদ্যাভাবে তাই।
শান্তি হবে অবশেষে বুঝিতেই পাই ॥

তাতে গরীবি হট্‌বে ২ সত্য রটবে দরিদ্র আর নাই।
টেষ্ট রিলিফের কাজ করিয়া বেঁচে থাকো ভাই ॥
রিলিফে মঞ্জুর হয় ২ সবাই কয় বেশ তো পরিমাণ।
মোল্লা-মুন্সী অর্ধেক খায় বড়ো মেহেরবান ॥'

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সম্পর্কে গ্রাম্য মানুষের ধারণা আচ্ছন্ন। পেটের দায় বড় দায়। কোন প্রকল্পই তাঁদের গ্রহণযোগ্য নয়— আগে চাই ক্ষুধার অন্ন। তাঁরা বুঝতেই পারে না অন্ন-বস্ত্রের অভাব কেন হল।

'ভারত সরকার চমৎকার দোষ নাহি তার
অনাহারে গরীবেরা অস্থি-চর্ম সার ॥
দেশে দেশে খাদ্যাভাব কেন দেখা দিল
কেরোসিনের দাম কেন এত বাড়িল ॥'

সরকার সহযোগী রমাকান্তর প্রস্তাব তাই চক্রান্ত বলেই মনে করে গ্রামবাসী। রমাকান্তকে তাঁরা 'সঠিয়া' অর্থাৎ 'দালাল' বলে চিহ্নিত করে, 'মোল্লা-মুন্সীর' একজন এই রমাকান্ত :

'সঠিয়া রমাকান্ত ২ কি চক্রান্ত করিয়া ফেলিল
ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কথা তুলিয়া ধরিল ॥
বেশী ছাওয়াল হলে ২ যায় অকালে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া
টাইট্-ফিট্ রাখতে হলে পরো জাঙ্গিয়া ॥
পরো টাইট্ বডিস্ ২ যত লেডিস্ বেঁধে ফেলো বুক
খাদ্যাভাবে গরীবের শুকাইল মুখ ॥'

হতচ্ছাড়া জীবন ও নিশ্চিত অনাহার সব শুভ প্রচেষ্টাকেই নষ্ট করে দেয়। অজ্ঞানের অন্ধকার জাতীয় জীবনকে প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে নেয়। গ্রাম-ভারতের উন্নয়নের কর্ণধারকে একথা মনে রাখা দরকার।

ইয়াহিয়ার পাশব অত্যাচারের বিরুদ্ধেও গ্রাম্য কবির লেখনী

উদ্ধৃত। কোচবিহারের খাপাইডাঙ্গার যতীন্দ্রনাথ সরকারের 'ইয়াহিয়ার দর্পচূর্ণ' কবিতায়ঃ

'তোর লজ্জা নাই ২ ধর্ম নাই ইহা মোদের জানা
নিরস্ত্র বাঙ্গালীর বুকে দিচ্ছ তুমি হানা।
তোর রেহাই নাই ২ বলে যাই ইয়াহিয়া খাঁন
এইবার তোর মরতে হবে রাবণের মতন॥
তোর ছল-চাতুরী ২ ভারিভুরি খাটিবে না আর তাই
মুজিবের মুক্তি ছাড়া তোর গতি নাই॥
তুই ইন্দিরারে ২ বারে বারে নিন্দা করিস পাজি
বিশ্ববাসী জানে তুই কত বড় হাজি॥'

আবার বিশ দফা কর্মসূচীকেও এক গ্রাম্য কবি সমর্থন করেছেন এই আশায়— তাঁদের দুঃখনিশার অবসান ঘটবে, সুদিন আসবে

'মোদের দুঃখ দশা ২ ঘুচবে নিশা গেল কাল রাত্রি
দেশ বাঁচিবার অধিকারে জাগলেন মহাননেত্রী॥
১৯৭৫ সন ২ ৩০শে জুন জানায় শুভ বাণী
বিশ দফা কর্মসূচীর উঠিয়াছে ধ্বনি॥'

কবির এই আশা পূর্ণ হয় নি, সে ভিন্ন কথা। গ্রাম-জীবনের গহন-গভীরে বয়ে চলেছে যে মৃদু গতিশীল জীবনস্রোত গ্রাম্য কবিতা তারই বাণী বাহক। সমর্থনে, প্রতিবাদে, দুঃখে, প্রেমে সে অনন্য। ব্যাপক জনজীবনের এ এক গণ-সাহিত্য। ঐ ঘুঙুরের তালে তালে কান পাতলে তার ছন্দকে বোঝা যাবে। বিশ্ব-নৃত্য উৎসবে তাই এই কবিকেও সাদর আমন্ত্রণ না জানালে জীবনের উৎসবে ঘাটতি থাকবে প্রচুর।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে কোচবিহার নিবাসী লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিতার হাতিয়ারকে তিনি ব্যবহার করেছেন সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের পোষকদের

বিরুদ্ধে। তাঁর লেখা জাপ বিরোধী 'জনযুদ্ধের ছড়া' বিক্রি হয়েছিল ৮০ হাজার। প্রবন্ধান্তরে সে কথা বলা হয়েছে।

গ্রামীণ জনগণের কর্মই জীবনের ধর্ম। গানই ঐ কর্মের প্রেরণা। এই কবিতা তাই জীবনের সোদর।

সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে হেটো কবির ঘুঙুরের ক্ষীয়মান ধ্বনি আপনার মনের এক অজানা জগতে ছায়া ছায়া কোন্ চিন্তার জন্ম দিচ্ছে কে জানে।

কবি ও কবিতা ঃ

১। ভালবাসার বিনিময়ে জীবন সাথী— শ্রীসুধীরচন্দ্র পণ্ডিত, জলপাইগুড়ি।

২। বিশ দফা কর্মসূচী— শ্রীসুধীরচন্দ্র পণ্ডিত, জলপাইগুড়ি।

৩। মালা বদল— শ্রীসুধীরচন্দ্র পণ্ডিত, জলপাইগুড়ি।

৪। ইয়াহিয়ার দর্পচূর্ণ— শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার, কোচবিহার।

৫। জান্নাতের পথে— মোঃ রহিম উদ্দিন মিঞা, কোচবিহার।

৬। স্ত্রীর শোকে স্বামীর মৃত্যু— শ্রীজুরানচন্দ্র সাহা, কোচবিহার।

৭। বিয়ের রাত্রে মেয়ে ও জামাই খুন— মোঃ জহর উদ্দিন মিঞা, কোচবিহার।

৮। ভাগিনীর সহিত মামার প্রেম— মোঃ জহর উদ্দিন মিঞা, কোচবিহার।

৯। কন্যাবলির কাহিনী অবলম্বনে— বিয়ে নয় টাকা —শ্রীবিপুল দেবনাথ।

১০। গরীবি হটাও— শ্রীপ্রমোদরঞ্জন মিত্র, কোচবিহার।

১১। কলির কথা— প্রফেসর বি. এ. খান।

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত ধর্ম

সত্যকে যখন জীবনের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে গ্রহণ করি তখন তা ধর্ম আর যখন সেই সত্যকে ঝাড়াই-বাছাই করে পরখ করে নিই তাকে বলি দর্শন। ধর্ম ও দর্শন আমাদের দেশে তাই একাকার। এখন এই ধর্ম বা দর্শনের মূল কথাটি কি? বৃহদারণ্যক বললো— অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বেদের প্রথম দিকে মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধা ততটা নেই। অথর্ববেদ তো ব্রাত্য মানুষেরই স্তব গাথা। অথর্ববেদের এই নর-নারায়ণ পূজা প্রাক্ আর্য ভারতের সমন্বয়ী দৃষ্টির ফসল।

বাংলা দেশে তাই বেদপন্থীদের তেমন কদর হয় নাই। চর্যাকার বলেছেন— "জেহের বান চিহ্ন রূব ন জানী/সো কইসে আগম বেএঁ বাখানী"— যার বর্ণ-চিহ্ন-রূপ জানা যায় না তার কথা আগম বেদ কি করে ব্যাখ্যা করে? বাংলার বাউল একেই আরও সহজ করে বলেন— "আছে এক মনের মানুষ পরম পুরুষ দেহের মাঝে বিরাজ করে।" বাঙ্গালীর সব সাধনাতেই এই মানব মহত্বের উপলব্ধি ধরা পড়েছে। বাংলার মাটি যেমন প্রতি বছরে বন্যাস্নাত-পলল-সমৃদ্ধ তার দেব-দেবীও তাঁদের পৌরাণিক খোলস ছেড়ে স্ত্রী-কন্যা-সন্তান হয়ে এসেছেন বাংলায়। প্রেমের ক্ষেত্রে কেউ বড়, কেউ ছোট নয়— মানুষের প্রেম মানুষের জন্য— এই ভাবনা ভারতের ঐক্য সাধনায় বাঙ্গালীদের দান। মানবপন্থী বাংলা তাই ভারতের শাস্ত্রপন্থীদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। ধর্মীয় কারণ ছাড়া আর্যরা সহজে আসতো না এই বাংলায়।

বাংলায় আছে নানা মত নানা পথ। কিন্তু কেউ মানবতাকে ত্যাগ করে নি। শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের বাইরে লোক বিশ্বাস আর ভালবাসার গভীরে তাই জন্মেছে কত না তিস্তাবুড়ি, কত না কাত্যায়নী ব্রত। আর্য সভ্যতার অগ্নি তিস্তা নদী পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন— বলেছেন শত পথ ব্রাহ্মণ। কিন্তু কেন? হয়তো, হয়তো নয়, সত্যই

এই অঞ্চলে তখনও ছিল সমৃদ্ধ জনপদ— সভ্যতা, সংস্কৃতি। মৃদু সংকোচ নিয়ে বলি, আসলে আর্য-কর্ষিত-ধর্মভাবনা জোর প্রভাবিত হয়েছিল বাংলার এইসব অঞ্চলের আবহমান থেকে চলে আসা মানবপন্থী লৌকিক আচার-বিচারের দ্বারা আর তা হয়ে পড়েছিল নামে মাত্র 'আর্য ধর্ম'।

বন কেটে বসতি তৈরী করবার সেই আদি পর্বে প্রকৃতি উদার ছিল না। কিন্তু কালজয়ী মানুষ শ্রম কিণাঙ্ক-কঠিন হাতে প্রকৃতির ঝুঁটি ধরে আদায় করলো ফসল। যাযাবর জীবনে এলো অবসর। গান রচনা করতে বসলো কবি। উত্তরবঙ্গের কৃষি-কেন্দ্রিক কয়েকটি অনুষ্ঠান আজও সেই ইতিহাসের বার্তাবহ।

শিব অন্যতম কৃষি দেবতা। কুচুনীর প্রেমে পাগল কৃষক শিব উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোক দেবতা। উত্তরবঙ্গের কোচ, মেচ, রাজবংশী, রাভা, গারো, লেপচা, সিকিমী প্রভৃতি বিচিত্র আদিবাসী অধিবাসীদের কাছে শিব নানা ভাবে উপাস্য দেবতা।

রাজবংশী সমাজের 'গারাম পূজা' লৌকিক শিবেরই পূজা। অমঙ্গল নাশ ও কৃষির উন্নয়নে এই পূজার অনুষ্ঠান। গোরক্ষনাথের পূজাও রাজবংশী সমাজের আর একটি অনুষ্ঠান। আলোচাল, কলা প্রভৃতি অনাড়ম্বর অর্ঘ্যে পূজা করেন একজন অধিকারী। ক্ষেতের ফসল ও গোয়ালের গরুর মঙ্গল কামনাই এখানে মুখ্য। আসলে এও শিব পূজা। শীত, বর্ষা ও শরৎকালে গোয়াল ঘরের সামনে পাঁচালীর ঢং এ গাওয়া হয় এই গান। গাভী বাচ্চা দিলেও হয় গোরক্ষনাথের পূজা। গানের সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালিতে তাল ঠিক করা হয়ঃ

"শিবে (র) মাগন ভাই শিবের মাগন
ভাটি হৈতে আইল পীর হাতে কঙ্কণ।
হাতে কঙ্কণ পীরের মুখে চাপ দাড়ি
দই দুধ মাগিতে গেল নন্দ গোয়ালের বাড়ি।

হাই চাওরে কপিলী গাই
তোর কপালে দুধ-ভাত খাই।" —ইত্যাদি

লোকায়ত শিবের আরও একটি পূজা হচ্ছে 'শাল-শিরি'। উত্তরবঙ্গের অরণ্য নির্ভরতার প্রতীক এই পূজা। শাল-শিরিও শিব। বন থেকে খাদ্য তথা ফসল ফলাতে চাই এই লৌকিক দেবতার কৃপাদৃষ্টি। তা ছাড়া আছে নীলের গাজন, আছে বিশুয়া অনুষ্ঠান। সোনারায়ের পূজাও আসলে শিব পূজা। ফসল কাটার সময় পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। সোনারায়ের গান গেয়ে মাগন মাগে ছেলের দল। সোনারায়ের দয়ায় কৃষির মঙ্গল বিশেষ করে কৃষি-সহায়ক গবাদি পশুর। সোনারায় দক্ষিণবঙ্গে বাঘের দেবতা। কিন্তু উত্তরবঙ্গে এটি মূলতঃ কৃষি কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে মনে আসছে উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্রবাহন এক দেবীর কথা। কোথাও কোথাও একে বলে ভাণ্ডানী দেবী। ফসল বোনা ও ঘরে তোলার সঙ্গে এই দেবী পূজার ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষ্য করে একে বলা চলে ফসলের এক লৌকিক দেবী। মেখলীগঞ্জ ও হলদীবাড়ী আর জলপাইগুড়ির কিছু অংশে এই দেবী পূজিতা হন। অরণ্য-সমৃদ্ধ উত্তর-বঙ্গের কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বন, বনের রাজা বাঘ আর সেরা কৃষক শিব ঠাকুর।

শিব ঠাকুরের একটি অনবদ্য মানবিক রূপ পাওয়া যাবে মালদহের 'গম্ভীরা' গানে। অভাবী মানুষ গম্ভীরায় শিবের কাছে তার মর্মবেদনা ব্যক্ত করেছে নিতান্তই মানবিক দুঃখাতি নিয়ে। গম্ভীরায় চাষী শিব :

"দামরার উপর চড়া বুড়হা
কুচনী পাড়ায় বেড়ায় ঘুর্যা।"

সূর্যদেবতার রূপান্তর অনেকে লক্ষ্য করেছেন এই গম্ভীরা অনুষ্ঠানে। মালদহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ব্যাপক ভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত একসময়ে। আজও এর জনপ্রিয়তা কমে নি।

কৃষির সঙ্গে জলের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এই জলের কামনায় মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে বেদের সময় থেকে। ঋকবেদের সপ্তম মণ্ডলের ১০৩

সুক্তটির নাম "মুণ্ডুকসুক্ত"। বৃষ্টি কামনায় ব্যাঙ পূজা তথা ব্যাঙের বিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসছে। কৃষক রমণাগণ খোলা মাঠে দুটি ব্যাঙকে বর-কনে সাজিয়ে বিয়ে দেয় আর গান গায়ঃ

"ব্যাঙের বিটির বিয়া গো
গলায় হাঁসুলি দিয়া গো
ও বেঙি মেঘ দেছ না কেনে ?"

ফসলের জন্য বৃষ্টি কামনায় আরও একটি লোকায়ত উৎসব উত্তর-বঙ্গের 'হুদুমা' উৎসব ও নাচ। 'হুদুমা' শব্দটির অর্থ "উলঙ্গ"। অমাবস্যা তিথিতে অথবা অন্ধকার রাত্রে বাড়ী থেকে কিছু দূরে সধবা কৃষক বধূগণ সমবেত হন। রমণীগণ বিবস্ত্রা হয়ে পূজার অনুষ্ঠান করেন। দু-জন স্ত্রীলোকের কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল জুড়ে দেওয়া হয়। অপর একজন স্ত্রীলোক হাল চালান। সমবেত মেয়েরা নৃত্যের তালে তালে গান করেন ঃ

"হিস্ হিলাইছে কমড়টা মোর শির শিরাইছে গাও,
কুণ্টেক না গেলে এলা হুদমার দেখা পাও।
পাটানিখান পড়ছে খসিয়া,
আইসেকরে হুদমা দেও
তোর বাদে মুই আছরে বসিয়া।
ডিংশাল শাল কমড়টা,
তাতে নাই মোর ভাতারটা,
কর কি মুই কায়বা কয়,
কোণ্টে গেইলে দেখা হয়,
দেখা হইলে দ্যাহটা জুড়ায়।"

নারী উর্বরতার প্রতীক। বৃষ্টি ফসলের প্রতিশ্রুতি। তাই নগ্ন নারীর সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক কল্পনা অনেক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। এই অনুষ্ঠানের পালে এখন তেমন হাওয়া নেই। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের বাঁশ পূজা একটি লৌকিক অনুষ্ঠান। এর গান এখন বিলুপ্তির পথে। এটি

আসলে মদনোৎসব। এর অপর নাম তাই "মদন কাম"। এর গান ঃ

"ভাটি হাতে আইল কুচুনী হাতে পিতলের খাড়ু
তায় সেনে বানাইতে পারে মদন কামের নারু।"

আসামের বিহু উৎসবের সঙ্গে এর কোন যোগ আছে কি ? ভাবনার বিষয়। উত্তরবঙ্গের "ধত্তি পূজা" আরও একটি লোকায়ত অনুষ্ঠান। ফসলের মঙ্গল কামনায় ক্ষেতের ধারে কলাগাছের চারা রোপণ করে দুধ ও কলা দিয়ে সম্পন্ন করা হয় এই ধত্তি বা ধরিত্রী পূজা।

উত্তর বাংলার ফসল রোপণ করা, রক্ষা করা, ঘরে তোলা, সব ব্যাপারেই রয়েছে প্রাণের সম্পদ, পেটের আহার সংগ্রহের শুভ কামনায় বহু লৌকিক অনুষ্ঠান। এ ছাড়া এখানে নদী দেবতা, যেমন তিস্তাবুড়ি; ভূত-প্রেত দেবতা, যেমন মাশান; কুমারী মেয়ে দেবতা, যেমন কুমারী ব্রতে; গাছ দেবতা, যেমন কোচবিহারের সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের কামরাঙ্গা গাছরূপী কামাখ্যা দেবী। আরও মজার ব্যাপার এই যে এই সব লৌকিক দেবদেবীর পূজার মন্ত্রও সাধারণ মানুষের মুখের সাধারণ ভাষা। এ দেবতারা সকলেই অল্পে তুষ্ট, ঠিক শান্ত-শিষ্ট গ্রামীণ জনসাধারণের মত।

একটু দুধ-ভাতের জন্য বাঙ্গালী মোক্ষবাঞ্ছা ত্যাগ করেছে। সে চিরদিন চিরায়ত প্রার্থনা জানিয়ে এসেছে "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। আর যে দেবতার দরবারে এই আর্জি তার অবস্থাও সুবিধের নয়। সে দেবতা স্বর্গ ছেড়েছে— মর্তে এসেছে, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার মাঝের চরে বসতি করেছে, ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফলা গড়েছে; তবুও তার অসহায় অবস্থা। উত্তরবঙ্গের অভাবী মানুষের প্রতিনিধি তাই শিব ভিক্ষাজীবী প্রান্তিক কৃষক মাত্র।

আসলে উত্তর বাংলার গণ মানস দেবতাকে দেখেছে তাঁদের সংসারের সহজ সরল ক্ষেত্রে। আদিম মানুষের শিকার ধরার মত তন্ত্র-মন্ত্রের ফাঁদ তাঁরা পাতেন নি। দেবতাকে তাঁরা দেখেছেন নদীর প্রশস্ত বুকে, সবুজ ফসলের প্রান্তরে, গৃহ প্রাঙ্গণে খেলে বেড়ানো শিশুটির

মাঝে। জীবনের সহজ সরস ক্ষেত্রে দেবতার এই নিত্য যাওয়া আসা তাঁদেরকে বেঁধেছে মাটির প্রেমে; প্রিয়ার বাহুডোরে। উত্তরবঙ্গে এই সব লৌকিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাই স্বর্গ কামনা নেই, এই প্রেম অকৈতব নয়— কৈতব প্রধান।

এ হচ্ছে বাংলার দান— সত্যকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উপলব্ধি করা। চন্দনের নয়— মাটির তিলক ললাটে ধারণ, মর্ত মমতার আর এক নব বেদ, নব উপনিষদ। উত্তরবঙ্গের লোকায়ত ধর্মে ব্রাত্য বাঙ্গালীর যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তা হচ্ছে— মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার সুর যা জীবনকে ভালবেসে জীবনের জয়গানে মুখর।

কোচবিহারের গ্রাম-নামে সমাজ চিত্র

নাম শুধু নাম নয়। নাম ইতিহাসের হারানো সুতো। নাম—ইতিহাস। পথ-যাদুকর যেমন উৎসাহী দর্শকদের অবাক করে দিয়ে সুতো বেয়ে বেয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর পরক্ষণেই তাঁর হারানো টুপি বা গ্লাস হাতে করে নেমে আসে বিপুল হাততালির মাঝখানে : অনেকটা সেই রকম গ্রাম-নামের সুতো ধরে ঐতিহাসিক, গবেষক, ভাষাতত্ত্ব-জ্ঞানী পণ্ডিতও হারানো দিনের অবাক করে দেবার মত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

নাম শুধুই নাম নয়। নাম বহন করে অতীত কথাকে তার নিজ অঙ্গে। নাম ইতিহাসের ঘুমন্ত রাজকন্যার খবর দেয়। নাম সমাজ রুচির বাণীবাহক। নাম অকথিত ভাষার, অগীত সঙ্গীতের, না বলা বাণীর সুর ঝংকারের রুদ্ধ দরজার সামনে এনে আমাদের সকৌতুক প্রশ্ন করে "দেখতো আমায় চিনতে পার কিনা?" অজ্ঞতা আমাদের লজ্জা দেয়। নাম তাই শুধু নাম নয়। বৈষ্ণব পদকর্তারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামে পাগল হয়েছিলেন। প্রেম পাগলিনী শ্রীরাধার মতই কবে আমরা বলতে পারবো : না জানি কতেক মধু গ্রাম-নামে আছে গো— শ্যাম নাম নয়, শ্যামল গ্রাম-নাম গ্রাম-প্রাণ ভারতবাসীর সাধনার ধন।

এই অমূল্যরতন গ্রাম সম্পর্কে কিবা জানি আমরা। আমাদের তো "ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ"। যে যত সুকৌশলে গ্রাম সম্পর্কে নিজের অনভিজ্ঞতা প্রচার করতে পারে সে তত বিদগ্ধ ব্যক্তি। গ্রামের অর্থনীতি, তার ভাষা, তার জন্মলগ্নের ইতিহাস, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, রুচি, ঝোক সব কিছু গ্রাম-নামের সুতোয় গাঁথা।

কোচবিহারের গ্রামের নামগুলোর কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক। দেখা যাক তার গ্রাম-নামগুলো তার ইতিহাসকে কী ভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ এক স্বাধীন কোচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি অনুযায়ী কোচবিহার রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় ইংরেজ সরকারের উপর। ১৯৫০-এর ১লা জানুয়ারী থেকে এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং রাজার শাসন এই অঞ্চলে ছিল অপ্রতিহত। রাজকীয় সমারোহে যুদ্ধ বিগ্রহ, মৃগয়া, শাসন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান সবই হয়েছে এক সময়ে। এই সব স্মৃতি আজ জনমানসে ধূসর হলেও, ইতিহাসের শীর্ণ পাতায় অক্ষম লেখকের লজ্জার কারণ হলেও, গ্রাম-নামে রাজতন্ত্রের অতীত দিনের অনেক চিহ্ন লেগে আছে।

রাজতন্ত্রের স্মৃতিবাহক এমন কয়েকটি গ্রাম-নাম : আঠার কোঠা, হাতী ডোবা, পিঞ্জারীর ঝাড়, আয়ীরাণী চিথলিয়া, দুর্গ নগর, মারপাড়া, দেওয়ান কোট, জয়দুয়ার।

নরনারায়ণ তাঁর সতেরজন ভাইকে সঙ্গে করে গদাধর নদীর পূর্ববর্তী অংশে (চারসি— পূর্বনাম) কিছুদিন বাস করেছিলেন। আঠার ভাইয়ের বাসস্থান বলে 'আঠার কোঠা' নাম প্রচলিত।

'হাতী ডোবা' নামটির সুন্দর একটি ইতিহাস আছে। কুহিচা নামে মহারাজ নরনারায়ণের এক প্রজা নিয়মিত রাজস্ব দিত, কিন্তু কখনো রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত না। মহারাজ একদিন নিজেই গেলেন তার বাড়ী প্রজার দর্শনপ্রার্থী হয়ে। কুহিচা পরিবার পরিজন ও বাড়ীসহ জলাশয়ে পরিণত হল। এর নাম প্রজাখাত। রাজা মন্ত্রী সকলেই জলাশয়ে পরিণত হল। এই জলাশয়ে হাতী, ঘোড়া ডুবে মরে। হাতী ডুবেছে বলে হাতী ডোবা > হাতী ডুবা হয়েছে।

মুসলমান সংশ্রব ঘটেছিল এই রাজ্যে। কামতা রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল অনেকটা মোগল-পাঠান আক্রমণে। কান্তনাথ হলেন কামতেশ্বর। ব্রাহ্মণ শশীপাত্রের অভিশাপে তাঁকে পরাভব স্বীকার করতে হয় দিল্লীশ্বরের কাছে। রাজাকে লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হয়। পিঞ্জরের বাহকগণ বিশ্রামের জন্য যেখানে পিঞ্জর নামান, সেই

স্থানের নাম পিঞ্জারীর ঝাড়। রাজা অবশ্য কাজলীকুণ্ডের জলে অন্তর্ধ্যান করেন। সেই অঞ্চলে মীরপাড়া, মীরের কুঠি কোচবিহার রাজ্যের মুসলমান শাসকদের স্মৃতিকে মনে আনে।

দুর্গানগর নামটি দুর্গা নামে এক বারবধূর নামে চিহ্নিত। "পরে কামতেশ্বর বিপিন মৃগয়া করার কারণ গমন করিয়া দুর্গা নাম্নী কোন বারবধূর নিকট রাত্রিবাস করিয়া থাকাতে তুষ্ট হৈয়া জীবন উপায় কারণ তাহার বাড়া জমি যে ভুগুত্তর (ভোগোত্তর) দিয়াছেন ঐ স্থানের নাম দুর্গাপুর। যেখানে বন্দর করিয়া দিয়াছেন ঐ স্থানের নাম দুর্গানগর" (মহারাজ বংশাবলী— শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত)।

কোচবিহার থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে কোচবিহার-আসাম জাতীয় সড়কের ৭ কিলোমিটার উত্তরে অরুণী বা আয়ীরাণী চিতলিয়া গ্রামটি তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত। এখানে একটি চণ্ডী ঠাকুরাণীর মন্দির রয়েছে। কোচবিহারের নাজির খগেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দির স্থাপন করেন। এই গ্রামের পূর্বনাম চিথলিয়া-দলবাড়ি। আয়ী ও রাণী সমার্থক শব্দ। 'অরুণী' কি 'আয়ীরাণী' হয়েছে? দলবাড়া শব্দটিই বা বাদ গেল কেন?

দেওয়ান কোট, জয়দুয়ার ইত্যাদি আরও কত নাম ইতিহাসকে বহন করছে।

রাজাদের জমি বিলি-বণ্টন ব্যবস্থারও ইঙ্গিত বহন করে কোচবিহারের অনেক গ্রাম-নাম। কোচবিহারের ধর্মপ্রাণ রাজাগণ ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের জন্য জমি দান করতেন। এই জমিকে বলা হত "ব্রহ্মত্তর"। অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে এই "ব্রহ্মত্তর" শব্দটি যুক্ত রয়েছে: ব্রহ্মত্তর কশালডাঙ্গা, ব্রহ্মত্তর চাতরা, ব্রহ্মত্তর কুচলীবাড়ী। অন্য কাউকে ভরণ পোষণের জন্য দেওয়া জমিকে বলা হত "পেটভাতা", যেমন— পেটভাতা চন্দন চৌড়া। আবার দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমিকে বলা হত "দেবত্তর", যেমন— দেবত্তর পাণীগ্রাম। অনেক মুসলমান পীর ও পয়গম্বরের আগমন ঘটেছিল কোচবিহারে।

ব্রাহ্মণকে জমি দানের মত এদেরকেও জমি দান করা হত। এইরূপ জমিকে বলা হয় "পীর পাল" (পালক>পাল)। এরকম একটি গ্রামের নাম "পীর পাল সীতাই"। জমি বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত এই রকম আরও কয়েকটি নাম— নাজিরাণ দেউতিখাতা, তিস্তা পয়স্তি, দরপত্তনী ইত্যাদি।

গ্রাম-নামের গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। কখনো কোন একটি বিশেষ শব্দ উপসর্গের মত গ্রাম-নামের ঠিক আগে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো বা অনুরূপ শব্দটি যুক্ত হয়েছে গ্রাম-নামের শেষে অনুসর্গের মত।

যেমন "খারিজা" শব্দটি প্রায়ই গ্রাম-নামের পূর্বে যুক্ত হয়েছে: খারিজা দুর্গানগর, খারিজা দশগ্রাম, খারিজা কেশরীবাড়ী, খারিজা কাকড়িবাড়ী, খারিজা শিতলখুচী, খারিজা বড়ডাঙ্গা। এমন আরও কয়েকটা শব্দ হচ্ছে: নগর, আন্দরণ, বাজে জমা, ছাট, ছোট, বড়। যথাক্রমে উক্ত শব্দগুলো যুক্ত হয়ে তৈরী হয়েছে নগর সাহেবগঞ্জ, আন্দরণ ফুলবাড়ী, বাজে জমা শেওড়াগুড়ি, ছাট সিঙ্গিমারী, ছোট লালবাজার, বড় নাচিনা ইত্যাদি গ্রাম-নাম।

আবার অনুসর্গের মত যুক্ত হয়েছে বাড়ী, হাট, কুঠি, পুর, গুড়ি গঞ্জ ইত্যাদি শব্দগুলো।

'বাড়ী' শব্দ যুক্ত গ্রাম-নাম প্রচুর: বাগড়িবাড়ী, ফুলবাড়ী, কেশরীবাড়ী, নাটাবাড়ী, ফেরসাবাড়ী, আদাবাড়ী, ধলুয়াবাড়ী, খাগড়াবাড়ী ইত্যাদি।

'কুঠি' শব্দযুক্ত গ্রাম-নামও অনেক: রসের কুঠি, পানিমারার কুঠি, তুরকানীর কুঠি, দোলঙ্গের কুঠি ইত্যাদি।

'পুর' শব্দযুক্ত গ্রাম-নাম: কৃষ্ণপুর, বজরাপুর, রতনপুর, গোপালপুর ইত্যাদি।

'গঞ্জ' শব্দযুক্ত গ্রাম-নাম, যেমন— সাহেবগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, মেখলীগঞ্জ, গোসাইগঞ্জ।

'গুড়ি' শব্দযুক্ত— শেওড়াগুড়ি, পলাশগুড়ি, চাপাগুড়ি ইত্যাদি।

আবার কিছু গ্রাম-নামে আগেপিছে দু'টি শব্দ যুক্ত হয়েছে— আবাস রতনপুর (আবাস + রতন + পুর), ছোট আঠার কোঠা (ছোট + আঠার + কোঠা), খারিজা কাকড়ি বাড়ী (খারিজা + কাকড়ি + বাড়ী) ইত্যাদি। এ ছাড়া ছোট, বড়, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি বিশেষ পরিচয় বোধক শব্দযুক্ত গ্রাম-নাম সুপ্রচুর।

সংখ্যাযুক্ত শব্দযোগে গ্রাম-নাম গঠিত হয়েছে অনেক। যেমন— আটপুকুরী, বারকোদালী, দশগ্রাম, আঠারনালা, বাইশগুড়ি, বার-চাউয়া গারকুটা, সাতভাণ্ডারী, চৌকুনী ইত্যাদি। সংখ্যাশব্দের সঙ্গে বিশেষণযুক্ত গ্রাম-নামগুলো সত্যই এক নতুন সম্পদ।

সমাজজীবনে কখনো কোন ব্যক্তি প্রাধান্য পেয়েছে, আর তার নামেই হয়েছে কোন গ্রামের পরিচয়। ভবানীপ্রসাদ, প্রাণ মজুমদার, ফুলেশ্বরী, শুকারুর কুঠি, উপেন চৌকী, রামপ্রসাদ ইত্যাদি নামগুলো সমাজজীবনে ব্যক্তি প্রভাবের ফলশ্রুতি। যদি বলি— 'বিলাসী, রসরাজবালা ও ফুলেশ্বরী সোনার চালুন হাতে উছল পুকুরীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুখধান কুঠির হেমকুমারী আসবে বলে'— আপনারা বলবেন বেশ তো কাব্য করা হয়েছে। কিন্তু এ কাব্যকার তারাই যারা বিলাসী, রসরাজবালা, ফুলেশ্বরী, হেমকুমারী, সুখধানের কুঠি, উছল পুকুরী এইসব কাব্য সুষমাযুক্ত গ্রাম-নামগুলো রেখেছিলেন।

সমাজজীবনে জীবিকার পাশাপাশি রয়েছে সৌন্দর্যবোধ, প্রখর বাস্তবের সঙ্গেই রয়েছে সাহিত্যের বেণু-বীণা গাওয়া। আর তার কিছু চিহ্ন বহন করেছে কোচবিহারের কাব্য-গন্ধযুক্ত গ্রাম-নামগুলো। আলোক ঝাড়ি, মধুর বাসা, ঘিয়ের হাড়ি, রসের কুঠি, ক্ষিরের কোট, সোনা তুলি, রসিক বিল, দুয়াই শুয়াই, দুখাভুলার কুঠি এইসব নামগুলো নিতান্ত অরসিককেও রসসিক্ত করে তোলে। দুখাভুলার কুঠিতে এসে কোন দুঃখী হৃদয় শান্ত হয়েছিল বা কোন রসিকের স্মৃতি বহন করছে রসিক বিল অথবা প্রভাত-গোধূলীর স্বর্ণমায়া কোন গ্রামে বুলিয়ে

দিয়েছিল তার সোনা-তুলি এসব ভাবতে গিয়ে অবাক হতে হয়। সমাজজীবনের সুখ-সমৃদ্ধির স্মৃতিবাহী এইসব গ্রাম-নাম।

আবার কায়েতের বাড়ী, সুতার পাড়া, মীরের কুঠি, তুরকানীর কুঠি ইত্যাদি নামগুলো জাত-ভেদ প্রথার স্থায়ী ও প্রকাশ্য স্বীকৃতি।

কোচবিহারের অনেক গ্রাম-নামে মুসলমান প্রভাব স্পষ্ট। এই রাজ্যে মুসলমান আগমনের ইতিহাস বহন করছে ঐ নামগুলো।

প্রয়াত আচার্য সুনীতিকুমারের ভাষাজ্ঞান আমাদের গর্বের বিষয়; কিন্তু দেশীয় ভাষা সম্পর্কে আমাদের সীমাহীন অজ্ঞতা আমাদের লজ্জার কারণ। এই কোচবিহার জেলাতেই অনেক ভাষা ও উপভাষা রয়েছে। এর পরিচয় তো দূরের কথা এই উপভাষাগুলোর নাম পর্যন্ত অজানা অনেক প্রখ্যাত ভাষাবিদের কাছে। অন্য জেলা-গুলোতেও এক বিরাট ভাষা-ভাণ্ডার এখনও অজ্ঞাত। অথচ এগুলোই তো কোন ভাষার মূল সম্পদ। লোক সংগীত যেমন তার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে সুরের জগতকে, লোক ভাষাও সমৃদ্ধ করে ভাষা ভাণ্ডারকে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে। গ্রাম-নামেও অতীত দিনের ভাষার অর্থবহ সূত্র উপস্থিত; অঞ্চল বিশেষের কথ্যরীতির প্রভাবও গ্রাম-নামে লক্ষ্য করা যায়। আর এ সব সূত্র ধরেই কোন জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তির হদিস করা সম্ভব। ভাষা-গোষ্ঠীগত পরিচয়ই মানব সমাজকে প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি নিয়ে যেতে সমর্থ।

কোচবিহারের গ্রামের কিছু নাম লক্ষ্য করা যাক— ডাউয়াগুড়ি, ডহরের পার, ডুমানগুড়ি, ঢেকিয়াজান, ডুডুমারী, ডেডেয়ার পার, ঢাং ঢিংগুড়ি, ভারেয়া, টেঙ্গরমারী, ফুলকাডাবরী ইত্যাদি ড, ঢ ধ্বনিযুক্ত গ্রাম-নামগুলো ভাষাবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয় নিঃসন্দেহে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে হাট বা গঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোচবিহারের কিছু গ্রাম-নামের সঙ্গে "গঞ্জ" শব্দটি যুক্ত হয়ে এর অর্থনৈতিক প্রভাবের কথা ঘোষণা করে। কুমারগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, নাজিরগঞ্জ, মেখলীগঞ্জ ইত্যাদি এমন নাম। শেষোক্ত নামটি গুরুত্বপূর্ণ।

মেখলী বা মেখলা নামে এক প্রকার সৌখীন বস্ত্র তৈরী হত বর্তমান মেখলীগঞ্জ অঞ্চলে। সমস্ত কোচবিহারে উক্ত বস্ত্রের কদর ছিল। আজ ঐ অঞ্চলে মেখলা তৈরী হয় না কিন্তু মেখলীগঞ্জ নামটি ধরে রেখেছে অতীত দিনের এই অর্থনীতির পরিচয়কে।

সমাজে এক সময় 'টোটেম' (কৌলীক চিহ্ন) গ্রহণ প্রথা ছিল ব্যাপক। কোচবিহারের গ্রাম-নামগুলো দেখে মনে হয় বিভিন্ন মাছের নাম, গাছ, পশু ও পাখী 'টোটেম' হিসাবে গৃহীত হয়েছিল সমাজের কোন এক স্তরে। গ্রাম-নামে তার চিহ্ন আজও লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রাম-নামগুলো সমাজজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

পাখীর নাম যুক্ত গ্রাম— ঘুঘুমারী, শকুনীবালা, পাখিহাগা, চকিয়াছড়া, তুতিয়ার কুঠি, চিলাখানা, খারিজা কাউয়ার ডেরা, চকিয়াপরা ইত্যাদি।

'বাঘ' নাম যুক্ত— বাঘমারী, বাঘভাণ্ডার, বাগ(ঘ) ডোকরা ইত্যাদি।

'মহিষ' নাম যুক্ত— মহিষবাথান, মহিষকুচী, মহিষচরু ইত্যাদি।

বিভিন্ন গাছের নামে গ্রাম, শিমুলগুড়, পলাশবাড়ী, শালবাড়ী, ঝাউগুড়ি ঝাউকুঠি, বড়াইবাড়ী ইত্যাদি।

বিচিত্র দেব-দেবীর নামে গ্রামের নাম হয়েছে প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গে তথা সমস্ত ভারতবর্ষে দেব-নাম প্রভাবিত গ্রাম-নাম অসংখ্য। কোচবিহারের এই রকম কিছু গ্রাম-নাম— কৃষ্ণপুর, হরিপুর, রামপুর, মহেশ্বর, বাণেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরী, ব্যাঘ্রশ্বরী, চণ্ডীশাল, বোকালীর মঠ, বলরামপুর, গোপালপুর, জয় গোপালগঞ্জ, গোবিন্দপুর, দেবগ্রাম ইত্যাদি। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে এক এক অঞ্চলে এক এক দেবতার বা দেবালয়ের জন্য সেই অঞ্চলের পরিচয় কোন বিশেষ দেবতার নামে চিহ্নিত হয়েছে। দু-একটি নাম নিয়ে কথা বলা যাক : বাণেশ্বর— বাণাসুরের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির বলে নাম বাণেশ্বর। বাণরাজার ঈশ্বর অর্থাৎ মহাদেব। এই গ্রামের পূর্বনাম ছিল গের্দসাণ্ডারা। 'গের্দ' শব্দের অর্থ অঞ্চল। মহারাজ প্রাণ-

নারায়ণ এই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। এখানকার মন্দিরটি কোচবিহারের পুরাকীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

সিদ্ধেশ্বরী— কালীজ্ঞানে সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে পূজা করা হয়। বাণেশ্বর শিবমন্দির থেকে মাত্র ২½ কিলোমিটার দূরত্বে এই দেবায়তন। আটকোণা গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দিরে অষ্টধাতুর সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি। এই দেবতার নামেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে।

বোকালীর মঠ— বাণেশ্বরের কাছেই এই গ্রাম। বক > বগা অর্থাৎ সাদা রং-এর কালী, বগা + কালী = বোকালী এর সঙ্গে মন্দির অর্থবোধক 'মঠ' শব্দ যুক্ত হয়ে গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে। বগলাদেবী দশ মহাবিদ্যারই এক রূপ, আবার বৌদ্ধদেবী তারার সঙ্গেও সাদা (বগা) শব্দটির নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা দেবীকে উৎখাত করে কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কি? তা যদি হয়ে থাকে তবে এটি বৌদ্ধধর্মের ভগ্নদশার পরিচয় বহন করছে।

তাই বলি নাম শুধু নাম নয়। কোচবিহারের গ্রাম-নামগুলো তাই গোপনচারী, চিরজাগ্রত ইতিহাস।

উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতির অভিমানীরা

প্রকৃতির দুই রূপ। এক রূপ করাল বদনা, ভীষণা অস্থির বিদ্যুৎগর্ভা আর এক রূপ শান্ত মলয় সম্পাতে তন্দ্রা জড়ানো। যে আকাশ পূর্ণিমায় রাশি রাশি আলোর প্লাবনে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, সেই আকাশেই রাহু গ্রাস করে চাঁদকে। কলঙ্কে মসীলিপ্ত হয় পৃথিবী। তবুও চাঁদ ওঠে, সূর্য ওঠে। মানুষের সংসারেও ভুল-ত্রুটির, রাগ-অনুরাগের, বিরহ-মিলনের সেই চিরন্তন পদধ্বনি।

এই বিচিত্র মানব সংসারে নরনারীর বিরহ-মিলন, মান আর মাথুরের অপূর্ব কথা ছন্দিত হয়ে উঠেছে পল্লীবাংলার গানে গানে। লোক-গীতির সম্পদ উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধ করেছে। মণিময় খনি তার। কিন্তু সেই মণিকে পরিচ্ছন্ন করে কাব্য সরস্বতীর গলায় দোলায়ে দেবে সে মণিকার কোথায়? বর্তমান নিবন্ধ জানালা দিয়ে আকাশ দেখার প্রচেষ্টা মাত্র।

অভিমানে ভেঙে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের অভিমানী নারী। এই অভিমানে কখনো বা মেঘ, কখনো বা রোদ, কখনো বা নিতান্তই ছলাকলার প্রকাশ। কিন্তু এই অভিমান শরতের একখণ্ড সাদা মেঘের মত নিষ্ফলা নয়। বন্যা নদীর দুই তীরে যখন প্লাবন আনে, তখন মনে হয়, সে শুধুই ভয়ঙ্কর। কিন্তু এই প্রলয়ের মত্ততার পিছনেই থাকে পলল সঞ্চয়ের প্রতিশ্রুতি, যা থেকে আসে পৃথিবীর কোল ছাপিয়ে সবুজের প্লাবন।

অভিমানও আনে সংসারে সাময়িক বিপর্যয়। কিন্তু তা টিকে না বেশীক্ষণ। বন্যামুক্ত পলি সঞ্চিত ভূমির মতই পরিণতিতে সে দাম্পত্য প্রেমকে দেয় অমরতার স্বাদ। যা না থাকলে পৃথিবীর সব রস শুকিয়ে যেত।

প্রেমিকা নারীর মন রামধনুর সাত রং-এ রাঙানো। তার প্রেমের

কতই না বহুরূপী প্রকাশ। কোচবিহারের একটি প্রেমিকা নারী তার প্রেমিকের সামান্য একটু স্পর্শ পেয়েছে। সেই স্পর্শ তার জীবন যৌবনকে এক অদম্য চঞ্চলতায় ভরে দিয়েছে। কুমারী কামনার মণিকোঠা কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে অনাস্বাদিত প্রেমের মধুর গন্ধে। প্রেমিকের উপর তার অভিমানের অন্ত নাই।

"কোন এক বাবরী আওলা
আওলাইল মোর ঘারুয়া খোপা
আওলাইল, আওলাইল রে।"

এই কথা শুনে প্রেমিক চলে যাচ্ছে রাগ করে। আর সেই মুহূর্তে কুমারী কন্যা বলে ওঠে— তুমি রাগ করো না, তোমার আমার বিয়ে তো শীঘ্রই হচ্ছে। সমস্ত জীবনের অবলম্বন করে তোমাকে নেব আমি। প্রথম দেখাতেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।

"বন্ধু রাগ করিছেন ক্যানে ?
তোমার আমার বিয় হইবে আস্‌চে শনিবারে।"

এই অভিমান ঘর ছাড়ার প্রবৃত্তি যোগায় না। প্রেমের মোহাঞ্জন লাগায় দুটি আঁখির পাতায়। প্রতিদিনের গ্লানি, মালিন্য মুছে যায় এই অভিমানের অশ্রুতে। তাইতো প্রেমিকাকে বলতে শুনি— তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। তোমাকে পেয়ে এই কুঁড়ে ঘরই আমার স্বর্গ মনে হচ্ছে। এখানেই বাংলার বৈশিষ্ট্য। সে কাছেও টানে আবার দূরেও ঠেলে দেয়।

উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতিতে নারী মনের প্রেমানুভূতি, তার সংসার, তার অভিযোগ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। দর্পণের মত সেগুলো কাজ করছে সমাজচিত্রকে হুবহু ফুটিয়ে তুলতে। বিয়ে না হবার জ্বালা ঃ

"প্রথম যৌবনকালে না হইল মোর বিয়া,
আর কতকাল রহিম ঘরে একাকিনী হয়া,
রে বিধি নিদয়া।

বাপক না কও শরমে, মাওক না কও লাজে,
ধিকি তুষির আগুন জ্বলছে দেহির মাঝে,
রে বিধি নিদয়া।"

"আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।" আর প্রেমই প্রেমিকা নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ। প্রেম জাগানিয়া নারীর সঙ্গলাভ ইচ্ছাকে সে বিচ্ছেদের সকরুণ আর্তি দিয়ে প্রকাশ করে। যেমন করে বৈষ্ণব কবিকুল বলেছেন— "ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" উত্তরবঙ্গের অভিমানীরা বলে :

"ধু ধু কাশিয়ার ফুল
নদী হৈল কালা ছুল স্থুল।
নদী দেখিয়া পরাণ মোর কান্দেরে
মন মোর দিনে রাতে জ্বলেরে।"

এ দাহ অভাগী পল্লীবালার জীবন-নদীকে দুঃখের প্লাবনে ভরিয়ে দেয়। অভাগীর দুঃখে প্রকৃতিও বিমর্ষ, ব্যথাতুর :

কোড়া কান্দে, কোড়া কান্দে
ও বন্ধু কান্দে বালি হাঁস।
বনের হরিণী রে কান্দে
ছাড়িয়া মুখের গ্রাস॥
নলের আগুন তলে তলে
খাগড়ার আগুন জ্বলে রে।
মুই অভাগীর বুকের আগুন
দিনে রাতে জ্বলে রে॥

বিধি একদিন সদয় হয়। মেয়ে পরের ঘর করতে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও বিপদ কাটে না। অভাবের সংসার। কর্তাটির একমাত্র কাজ মৎস্য শিকার— তাও যদি ভাল মাছ হতো। তার উপর মেজাজটি সপ্তমে। হায়রে কপাল! কান্নায় কান্নায় ভাসিয়ে দেয় সে বুকের আঁচল :

"সাংনা মাছ মারে রে পুটি মাছ দিয়া
খাবার বেলায় চায় সাংনা বড় মাছের মুরা,
সাংনা মাছ মারে রে।
মোক মারলু ভাল করলু ছাউয়াক মারলু ক্যানে ?
সাংনা তোর পিতের নাড়ী নাই
সখের যৌবন মোর পোড়ায়া করলু ছাই।"

এই কান্নার কারণ পাওয়া যাবে পুরানো Settlement Report-এ। বার মাসের আয় চাষীর যা থাকতো রাজকর দিয়ে তার পরিমাণ ৩০ টাকার বেশী নয়। এ দিয়ে সংসার চলতো না।

উত্তরবঙ্গের লোকগীতিতে নায়ক-নায়িকার মিলনানন্দসূচক পদ খুবই কম। অভিসারিকার পদও বেশী নেই, আছে নারী হৃদয়ের বেদনাতি। কিছু সংখ্যক লোকগীতি আছে যা অভিমানের স্তর ডিঙ্গিয়ে নিষ্ঠুর বাস্তবতায় এসে মাথা ঠুকছে। সমবেদনায় আরক্ত হয়ে ওঠে মন এগুলো পড়লে। করুণ, খুব করুণ সেই কথা। উত্তরবঙ্গের একটি নারী তার স্বামীর ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছেন। স্বামী তার পরনারীতে আসক্ত। আশাহত নারীর মনের ব্যথা কথা-রূপ নিয়েছে অজস্র কান্নায়—

"মন সজনী কার কাছে কব দুঃখের কথা
কিসের মোর রান্ধন, কিসের মোর বারণ
কিসের মোর হলদিয়া বাঁটা।
আমার বধুয়া আন বাড়ী যায় মোর-এ আংগিনা দিয়া ঘাটা।
আর যদি শুনং আর যদি দেখং অন্য জনার সঙ্গে কথা
এ হেন যৌবন সাগরে ভাসাব, পাষাণে ভাঙ্গিবো মাথা।"

উপেক্ষিতা প্রেম-পাগলিনী নারী তার প্রিয়-মানুষটিকে পাবার জন্যে কি না করেছে। নিষ্ঠুর প্রেমিক ফিরেও তাকায় নি।

"মোর বন্ধু গান গায় মাথা তুলি না চায়
মুই নারী যাও জলের ঘাটে

থমকি থমকি হাটোং চোখে ইশারা করোং
তবু বন্ধু না দেখেন মোরে।"

ছিন্নমূল বনলতার অবস্থা তখন :

"মনের হাউসে বান্ধিনু গোপা আউলাইল দক্ষিণা বাতাসে
মন মোর উদাসী হৈল
সোনার বন্ধু কোথায় রৈল
আমি প্রেম-জ্বালা করিব শীতল কেমনে।"

না পাওয়ার বেদনা চিরন্তন। চিরন্তন পেয়ে হারানোর ব্যথা। পূর্ববঙ্গের একটি ছড়া এরই পাশে পড়া যায়—

"ওপারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লংকা গাছটি রাংগা টুক্ টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥

* * *

হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি॥

যে দুঃখের দরিয়া উত্তরণের আকুলতায় মৃত্যুর তুষার শীতল হাতকে স্পর্শ করবার কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যই মর্মান্তিক। কে জানে তার সংসারের খবর কি?

উত্তরবঙ্গের পল্লী কবিগণ বিরহিনী নারীদের কথা "বারমাস্যার" আকারেও প্রকাশ করেছেন। কবিদের এ ব্যাপারে সাফল্য চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রেমের স্বরূপকে এইসব পল্লীকবি বুঝেছেন অন্তর দিয়ে, প্রকাশ করেছেন অনবদ্য উপমার সরল মাধুর্যে।

চাঁদ যেমন নদীর জলকে আকর্ষণ করে, প্রেম যেমন জীবনটাকে টানে, প্রিয়জনও তেমনি ভাবে বিনা বাঁধায় বাঁধতে চায় প্রেমিককে—

"চান্দায় টানেন নদীর পানি,
পীরিত টানেন জান

তুমি আমার টানেন বন্ধু
নাইরে কুল মান।"

উত্তরবাংলার উদার পল্লী-প্রকৃতি সহজ সরল সম্পর্কে বেঁধেছে তার মানুষকে। অভাব-অনটনের মাঝেও তাকে করেছে হৃদয়াবেগে বলশালী নদীর মতই অবাধ গতিশীল। কৃষিকেন্দ্রিক স্তিমিত জীবন-যাত্রার পরতে পরতে পাওয়া না পাওয়ার কত না কথা, কত না ব্যথা; আর এ সবেরই ছন্দিত জীবন এ সব পল্লীগীতি।

অভিমানীদের এই মানপর্ব বিরাট। বেশী কথায় পুঁথি বড় হবার ভয়। হালের "গাথা সপ্তসতী" থেকে একটি শ্লোক উল্লেখ করার লোভ সামলানো যাচ্ছে না:

"কই অব রহিঅং পেমমং নহি হোই মামি মানুষে লোএ।
জই হই ন তস্‌স বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই।"

ছলাহীন প্রেম, সখী, মানুষের সংসারে হয় না। যদি হয়, তবে তাতে বিরহ নাই। তথাপি যদি বিরহ ঘটে তবে কে বাঁচে।

দুর্যোগের মেঘ অনেক সময় আনে প্রবল ঘূর্ণী। অভিমানও কখনো আনে পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন। শ্রীরাধা তাই সর্বকালের শ্রীমতীদের সতর্ক করে দিয়েছেন—

"কুলবতী কই নয়নে জানি হেরই
হেরত পুন জানি কান।
কানু হেরি জানি প্রেম বাড়ওই
প্রেম করয়ে জানি মান।"

কুলবতী হয়ে কেউ যেন পর পুরুষের দিকে না তাকায়; আর যদি তাকায় তবে যেন শ্রীকৃষ্ণের দিকে না তাকায়; আর যদিও বা তাকায় তবে ভুলেও যেন তার সাথে প্রেম না করে। আর যদিই বা প্রেম করে তবে তাতে যেন মানের স্পর্শ না থাকে।

আমরা বলি— প্রেম থাকলে মানও থাকবে।
অভিমান যুগে যুগে।

কোচবিহারের দেব দেউল

॥ এক ॥

"পাপী কো দোজখ নহী ধরমী দোজখ জায়
যহ পরমার্থ শুঝিকে মতি কোই ধরম কামায়।"

ভক্ত কবীরের এই উক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েও মানুষ মন্দিরে মসজিদে তাদের ধর্মীয় জীবনকে বর্ণবহুল করে তুলেছে। পথের প্রান্তে ও দুধারে তারা গড়ে তুলেছে অগণিত দেবায়তন। কালের অপ্রতিহত গতিতে ভক্তের স্রোত হয়ত কমেছে। মন্দির হয়েছে জীর্ণ তবুও সে ইতিহাস সযত্ন দৃষ্টি কেড়ে নেয় আজকের মানুষের।

আজকের কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে ৩,২৩৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ত্রিভুজাকৃতি একটি জেলা মাত্র। এক হাজার বছর পিছিয়ে গেলে এর ভৌগোলিক সীমা ও পরিচয় ভিন্ন রূপ নেয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষ, কামরূপ, কামতা এই নামগুলো উচ্চারিত হবে বর্তমান কোচবিহারের অতীত সীমা রেখাঙ্কনে। মনে আসবে খেন রাজবংশের নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ প্রভৃতি রাজার নামগুলো।

তাই ২৫°৫৮´ থেকে ২৬°৩৩´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°৪৮´ থেকে ৮৯°৫৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত বর্তমান কোচবিহারের দেবায়তনের পরিচয় প্রসঙ্গটি বর্তমান জেলার সীমারেখার বাইরেও অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

কোচ রাজবংশের প্রথম নরপতি বলে চন্দনের উল্লেখ থাকলেও ঐতিহাসিক ও রাজবংশের দৃষ্টিকোণ থেকে চন্দনকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় নি। মহারাজ বিশ্বসিংহ থেকে মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ অর্থাৎ ১৫২২-১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ এই রাজ বংশের রাজত্বকাল।

ভারতবর্ষের একটা সীমান্ত অঞ্চল বলে কালে কালে এই অঞ্চলে এসেছে নানা জাতি, নানা মত, নানা সংস্কৃতি ও ধর্ম। কোচবিহারের

রাজবংশ ধর্মের দিক থেকে শৈব। এক সময়ে এই অঞ্চলটি তন্ত্রের পীঠস্থান ছিল। বৌদ্ধ প্রভাব কাজ করেছে অনেক। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন শঙ্করদেব। মুসলিম ও জৈন ধর্মমত উল্লেখ-যোগ্য ফসল ফলিয়েছে। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রভাব ফেলেছিল কিছু সময়। এ ছাড়াও রয়েছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত নানাপ্রকারের দেবদেবীর মন্দির।

নদীবহুল এই অঞ্চলে অতি প্রাচীন তেমন কোন দেবালয় দেখা যায় না। প্রকৃতি ও বৈদেশিক আক্রমণ ধ্বংস করেছে অনেক দেব দেউল। বাঁশ, খড়, মাটি ইত্যাদির দেওয়াল আর টিনের চালা এই ছিল অধিকাংশ মন্দিরের উপকরণ। অনেকে মনে করেন ষোড়শ শতকের পর থেকে ইটের প্রচলন শুরু হয়েছিল। মন্দির নির্মাণ রীতিতে মুঘল প্রভাব লক্ষ্য করেছেন মাধোস্বরূপ বৎস। মন্দিরের উপর মসজিদের অনুকরণে গম্বুজ কোচবিহারের বাইরে কোন জেলায় নেই। কোন কোন মন্দিরের বাইরের দেয়ালের চার কোণায় মিনারের মত অট্টালিক আছে। এ সবই মুসলমান সংস্রবের কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরগুলো প্রায় অলঙ্করণহীন। পোড়া মাটির কাজ নেই বললেই চলে।

মন্দির নির্মাণ ব্যাপারে এই রাজ্যের রাজারা অগ্রণী হলেও, তাঁদের দেওয়ান, নাজির ও প্রজাগণ সমানভাবে উৎসাহী ছিলেন। প্রধান প্রধান মন্দিরগুলোতে নিত্য পূজার ব্যবস্থা ছিল। দেব দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত দেবত্র সম্পত্তি থেকে চলতো সেবার ব্যবস্থা। বর্তমানে এই ব্যবস্থা সংকুচিত।

॥ দুই ॥

প্রধান মন্দিরগুলোর মধ্যে প্রথমেই কোচবিহার শহরের মদন-মোহন মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রাজোপাখ্যানে'

জয়নাথ ঘোষ লিখেছেন যে মহারাজ রূপনারায়ণ শ্রীশ্রীমদনমোহনের 'অপূর্ব মূর্তি' প্রকাশ করে তার সেবার ব্যবস্থা করে দেন। রাজবাড়ীর সিংহদরজার ডান পাশে ছিল সেই দেবালয়। জনসাধারণের সুবিধার্থে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ শহরের প্রায় মধ্যস্থলে বৈরাগী দিঘীর উত্তর পাড়ে এই সুদৃশ্য মন্দিরটি নির্মাণ করান। কথিত আছে শঙ্করদেবের পরামর্শে মহারাজ নরনারায়ণ যে বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করান সেই বিগ্রহই বর্তমান মদনমোহন। মদনমোহন ঠাকুর এখানে একাকী পূজিত হন। শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবগণ নারায়ণের সাথে শক্তিরূপিনী লক্ষ্মীর পূজা করেন না। রৌপ্য নির্মিত সিংহাসনে সোনার মদনমোহন। তাঁর বামপাশে রৌপ্য সিংহাসনে মঙ্গলচণ্ডী, ডানপাশে প্রস্তর নির্মিত কালীপ্রতিমা। আর আছে রাজাদের স্বপ্নলব্ধ দুর্গামূর্তি। দেবীর মূর্তি লাল রঙের। অসুরের রং সবুজ আর দেবীর ডাইনে সাদা বাঘ, বামে সিংহ। দেবীবাড়ীতে এই মূর্তিই মাটিতে বড় আকারে তৈরী করে পূজা করা হয়। মন্দিরের চারিটি ঘরে অনেক দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। এই মন্দিরের উপর পদ্মকলস আমলকসহ সোনালী গম্বুজ। মন্দিরের গড়ন বাংলা চারচালা মন্দিরের রীতির। পাশাপাশি চারটি ঘর থাকায় দালান-মন্দির মত দেখায়। প্রবেশ পথ দক্ষিণে, উপরে নহবৎখানা ও বর্তমানে দেবত্তর আপিস।

এই জেলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির গোঁসানীমারির কামতেশ্বরী। রাজা প্রাণনারায়ণ যিনি ইতিহাসে Builder of Temples নামে খ্যাত তিনি ১৬৬৫ খ্রীঃ মীরজুমলা-বিধ্বস্ত মন্দিরটি নির্মাণ করান। এই দেবী মূর্তি-বিহীন লৌকিক দেবী। ভগদত্ত-কবচ এই মন্দিরের আকর্ষণ হলেও তা দৃশ্য নয়। কামতেশ্বরী দেবী গোসানী বলেও পরিচিত। কামতেশ্বরের অলৌকিক বৃত্তান্তও লেখা রয়েছে 'গোসানী মঙ্গল' কাব্যে। কামতা বা গোসানী নাম নিয়েও মতান্তর আছে। কামদা থেকে কামতা, গোস্বামিনী থেকে গোসানী, না কামতা রাজ্যের রাজার প্রতিষ্ঠিত বলে কামতেশ্বরী? কামাখ্যার অপভ্রংশ নয় তো এই কামতা? ডঃ

আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই দেবীকে আঞ্চলিক বা লৌকিক বলার পক্ষপাতী। মন্ত্রী শচীপাত্রের পত্নী ক্ষেমাদেবীর নামটি গোসানী নামের আড়ালে রয়েছে কী? সর্প স্পর্শজনিত রাজ্যলাভ ইত্যাদি কাহিনী জানতে হলে সুবোধ ঘোষের 'কিংবদন্তির দেশে' ও রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর 'গোসানী মঙ্গল' পড়তে হবে। মন্দিরটি চারচালা রীতির চারকোণা ঘরের বাঁকানো কার্ণিশের উপর গোলাকার গম্বুজ। স্থাপত্যের দিক থেকে মুসলমান প্রভাবিত। মন্দিরের উচ্চতা ১৪ মিটার। গর্ভগৃহের ব্রোঞ্জের সূর্যমূর্তিটি সম্ভবতঃ পাল যুগের। প্রতিষ্ঠা-ফলকে প্রাণনারায়ণ দেবীকে ভবানী বলে উল্লেখ করেছেন।

উত্তরবঙ্গে শিবের আসন সর্বত্র। হিমালয় নাকি গোটা কোচবিহার অঞ্চলটাই শিবকে যৌতুক হিসাবে দান করেছিলেন। শিব মন্দিরের সংখ্যা অন্য দেবতাদের চেয়ে বেশী রয়েছে। কোচবিহার থানার ধলুয়া-বাড়ীর শিব মন্দিরটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শহর থেকে কোচ-বিহার-দিনহাটা পাকা রাস্তার ধারে, ৬.৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এই মন্দিরটি।

পোড়ামাটির ফলকযুক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির কোচবিহারে আর নেই। সম্ভবতঃ পশ্চিম দিনাজপুর ছাড়া উত্তরবঙ্গের অন্যত্র এমন মন্দির নেই। মন্দিরের চারকোণায় চারটি রত্ন থাকলেও মাঝের বৃহত্তর রত্নটি অনুপস্থিত। অনেকে মনে করেন কোচবিহারে স্বল্পকালীন মুসলমান আধিপত্যের সময়ে এই রত্নটি ভেঙ্গে মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিলতা'য় হিন্দু মুসলমানের পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে যে চিত্র এঁকেছেন তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যেতে পারে :

"ধরি আন এ বাঁভন-বড়ুআ
মথাঁ চড়াব এ গাইক চুড়ুয়া।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তাঁর মাথায় দেয় গরুর রাঙ, ধোয়া উড়িধানে তৈরী করে মদ আর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানায়। —এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু স্মরণ রাখলে এই অঞ্চলে অনেক মন্দিরের স্থাপত্যরীতির পরিচয় বুঝতে অসুবিধে হবে না। বর্তমান মন্দিরের উচ্চতা ৯·১ মিটার। উত্তর দেয়ালে 'মিহবার' আছে। সম্ভবতঃ কোচবিহার রাজবংশের দশম রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ (১৭১৪-১৭৬৩) সিদ্ধনাথ শিবের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে এটির নির্মাণকার্য মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময় শুরু হয়ে তাঁর ছেলে শিবেন্দ্রনারায়ণের সময় শেষ হয়। মন্দিরটির কারিগর মুসলমান হওয়া সম্ভব। পোড়ামাটির ফলকগুলোতে (যাদের বর্তমান সংখ্যা ৫৫) আছে দশাবতার, বন্দুকধারী সৈন্য, নর্তকী মূর্তি ও লতাপাতার অলংকরণ।

সিদ্ধনাথ শিব মন্দিরের সন্নিকটে শাহ পীরের দরগা। অষ্টাদশ শতকের এই মুসলমান ধর্মপ্রচারককে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ৭৭ বিঘা 'পীর পাল' জমি দান করেন। এই প্রসঙ্গে এ কথাটিও স্মরণীয়।

ইটের তৈরী প্রায় ৭ মিটার উঁচু হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দিরটি। সাগর দিঘীর পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। বাঁকানো কার্ণিশের নিচের অংশ খাঁজ কাটা। শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা হয়। শিববংশীয় রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। একটি শ্বেত প্রস্তরের সংস্কৃত ভাষায় বাংলা হরফে প্রতিষ্ঠাফলক রয়েছে।

দেবীবাড়ির বড় দেবী— লোকশ্রুতি রয়েছে একবার নরনারায়ণের ভাই নরনারায়ণকে হত্যা করতে গেলে দেবী দুর্গা দশভূজা হয়ে রাজাকে রক্ষা করেন। সম্ভবতঃ নরনারায়ণ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'বড় দেবী' একাকিনীই পূজিতা। এই দুর্গা দশভূজা, সিংহ ও ব্যাঘ্র বাহনা অসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা। মণ্ডপের বাইরে আটটি

থাম দেখে ইউরোপীয় প্রভাবের কথা মনে আসে। ছাদের কার্ণিশের নিচে একটি ত্রিকোণ নক্সা আছে।

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের বড় রাণী কামেশ্বরী দেবী ডাঙ্গর-আয়ী (বড় রাণী) নির্মাণ করান গুঞ্জবাড়ীর ডাঙ্গরআয়ী মন্দিরটি। প্রধান বিগ্রহ দুর্গা . কিন্তু কালী, শিব, রাধাকৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি দেবতাও রয়েছে। প্রবেশ দ্বারের উপরে নহবৎখানা, তার উপর তিনটি রত্ন। মন্দিরের প্রবেশ পথে প্রবেশ ফলক থেকে জানা যায় ১২৯০ সালে (১৮৮৪ ইং) এটি নির্মিত হয়। প্রস্তর ফলকটির পাঠ নিম্নমত :

প্রাসাদং শরশূন্য হস্তি ধরনৌ সকান্তিকে
সংনির্মায় শিবেন্দ্র ভূপমহিষী শ্রীশ্রীল কামেশ্বরী॥
দুর্গাভক্তিযুতোত্তরায়ণ সমাখ্যানে রবেঃ সংক্রমে।
পৌষে ত্রিংশমিতে দিনে স্ম করুতে তস্য প্রতিষ্ঠা বিধিঃ॥
১২৯০ সাল॥

কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাণেশ্বরের শিব মন্দির। এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিয়ে মতভেদ স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বাণাসুর, রাজা জল্পেশ্বর, রাজা নীলাম্বর, মহারাজ নরনারায়ণ ইত্যাদি ব্যক্তির নাম শোনা যায়। মহারাজ প্রাণনারায়ণ এটি সংস্কার করেছিলেন বলে বলা হয়। রাজা বাণ শিবকে স্বর্গ থেকে আনতে গিয়ে শর্ত ভঙ্গের ফলে অদৃশ্য শিবের উদ্দেশ্যে এই মন্দির নির্মাণ করেন। আর এই অঞ্চলের নাম রাখেন বাণেশ্বর। বর্তমান মন্দির গম্বুজযুক্ত চারকোণা, উচ্চতা, ১০·৯ মিটার। প্রায় ৩·১ মিটার নিচে সিঁড়ি দিয়ে নামলে শিবলিঙ্গ। পাশেই পুকুর, তাতে প্রচুর কচ্ছপ। যথারীতি মন্দিরে পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল রয়েছে। পাশের টিনের চার চালা মন্দিরের শিব মূর্তিটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি বলেই মনে হয়। বাণেশ্বর

মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে একটা অর্বাচীন কালী মূর্তি। মূর্তিটি পাথরের। দেবীর নিত্য পূজা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ও অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে বলা হয়েছে বাণেশ্বরে নাকি মোরগও বলি দেওয়া হয়, আর ফাঁস দিয়ে হত্যা করা এখানকার প্রচলিত রীতি, তান্ত্রিক প্রথা (২য় মুদ্রণ, পৃঃ ৫৬)। পাঠা শিবকে উৎসর্গ করা যায় না, অর্দ্ধনারীশ্বর দুর্গার উদ্দেশ্যে তা ছেদন করা হয়। আর খাসি শিবের উদ্দেশ্যে ফাঁস দিয়ে কীলক ঠুকে মারা হয়। —এ প্রথা বৈদিক, তান্ত্রিক নয়।

মধুপুর গ্রামের পশ্চিমে হরিপুরে তোর্ষা নদীর ধারে ভূমিকম্পে বসে যাওয়া হরিপুর শিব মন্দির। উচ্চতা ৭·৮ মিটার থেকে বর্তমানে ৪·৬ মিটারে দাঁড়িয়েছে। ২·৫ মিটার নিচে নেমে লিঙ্গ দর্শন করা যায়। অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময়ে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ এটি নির্মাণ করান।

বাণেশ্বর শিব মন্দির থেকে ২½ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। আট কোণা, গম্বুজবিশিষ্ট পাকা মন্দিরটি উচ্চতায় ৯·৩ মিটার। মূর্তিটি পিতল বা অষ্টধাতুর তৈরী, উচ্চতায় ১৫·৫ সেন্টিমিটার। আট কোণা সগম্বুজ মন্দিরটি কোচবিহারে এই একটাই। বৎসের মতে মন্দির নির্মাণে বৃটিশ স্থাপত্যের প্রভাব অতিমাত্রায় রয়েছে। মন্দিরটি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে নির্মিত।

তুফানগঞ্জের বারকোদালিতে দামেশ্বর শিব মন্দির। চার চালা টিনের ঘর। ভিত্তি বেদী ও মেঝে পাকা। শুক্লধ্বজ নাকি এর প্রতিষ্ঠাতা। শিবলিঙ্গ ছাড়া কালী ও নারায়ণ শিলা আছে।

কোচবিহার থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে টিনের ঘরে মাটির বেদীতে কৃষ্ণ-বলরামের বিগ্রহ। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক দামোদর দেবের তিরোভাব তিথিতে

এখানে মেলা বসে। বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়।

তুফানগঞ্জ থানার ভুচুংমারিতে বলরাম ঠাকুরের মন্দির। মন্দির টিনের চালা ঘরের। বিগ্রহ পিতলের— বলরামের ছোট বড় দুটি মূর্তি রয়েছে। বিশেষ পার্বণ রূপে রথ, জন্মাষ্টমী, দোল ইত্যাদি হয়ে থাকে। মন্দিরটি এক সময়ে পাকা ছিল— বর্তমানে বিধ্বস্ত।

কোচবিহার থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ মধুপুর ধাম। ১৯৬৪ সালে বর্তমান শঙ্কর মন্দিরটি নির্মিত হয় অসমীয়া বৈষ্ণব ভক্তদের অর্থ সাহায্যে। প্রবেশ পথের উপরে দেয়ালে বালি সিমেন্টের শুকদেব, গরুড়, হনুমান ইত্যাদি রয়েছে। মন্দির শিখরে পদ্ম, আমলক, কলস ও বিষ্ণুচক্র; মন্দিরের গায়ে শ্বেত পাথরের গায়ে 'ঘোষা' বা পদ (শঙ্করদেব ও মাধবদেব রচিত) উদ্ধৃত। পূর্বে এখানে টিনের মন্দির ছিল। বীরনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ এই ধাম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু জমি দান করে গেছেন। মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণবতীর্থ এটি।

টিনের চার চালাযুক্ত পাকা মন্দিরটি শুক্লধ্বজ প্রতিষ্ঠিত। অনেকে এটির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নাজির দেও-এর নাম উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ নাজির দেও মন্দিরটির সংস্কার করেছিলেন— আমরা তুফান-গঞ্জের নাককাটি গাছের যণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরের কথা বলছি। বর্তমান মন্দিরের পিছনে একটি ভগ্ন মন্দিরের স্তম্ভ ও গম্বুজ বিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। তবে কি শুক্লধ্বজের মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ এগুলো? লোকশ্রুতি আছে এই মন্দির থেকে মহাদেব রায়ডাক নদীতে এসে স্নান করে যান। অশোকাষ্টমীতে রায়ডাক নদীতে বহু লোক তাই স্নান করতে আসেন।

আয়ীরাণী চিতলিয়া গ্রামে কোচবিহারের জনৈক নাজিরের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী ঠাকুরাণীর মন্দির। পুরাণো মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বর্তমান মন্দির কাঁচা টিনের চার চালা। কাঠের সিংহাসনে চণ্ডীমূর্তি, পাশে জয়া ও বিজয়া। মূর্তিগুলো অষ্টধাতুর।

তুফানগঞ্জের চামটা গ্রামে আছে ঘূর্ণেশ্বরী দেবীর মন্দির। পাকা ভিত্তি চার চালা টিনের মন্দির। ত্রিকোণ সিঁদুরলিপ্ত পাথরই ঘূর্ণেশ্বরী দেবী। কালীস্বরূপা দেবীর পাশেই ত্রিশূলরূপী ভৈরব। এই দেবী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটির সংস্কার করেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

॥ তিন ॥

এ ছাড়াও দিনহাটা ও তুফানগঞ্জের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন মদনমোহন মন্দির, টাকাগাছের নৃসিংহ ঠাকুরের মন্দির, আকুয়া পাথরের ক্রোটেশ্বর (ক্রোধেশ্বর ?) শিব মন্দির, গোসাইগঞ্জের বামাকালী মন্দির বিখ্যাত। এ ছাড়াও প্রচুর অখ্যাত দেবালয় জেলার সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে।

কোচবিহারের রাজাগণ তাঁদের রাজ্যের বাইরেও দেবায়তন প্রতিষ্ঠা করেছেন ও অনেক মন্দির সংস্কার করেছেন। বিধর্মী কালাপাহাড় ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করে। তাঁর আক্রমণে কামাখ্যা মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ নরনারায়ণ তাঁর ছোট ভাই শুক্লধ্বজের সাহায্যে মন্দিরের সংস্কারকার্য সমাধা করেন। মহারাজ নিজেকে 'কামাখ্যাচরণাশ্রিত' বলে মনে করতেন। কামাখ্যা মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে মন্দির রক্ষকরূপে নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের প্রস্তরমূর্তি রয়েছে। মন্দিরের নিত্যপূজার জন্য দেবত্র সম্পত্তি দান করেন। মহারাজ গোপনে দেবীর নৃত্য দর্শন করায় এই রাজবংশের কোন রাজা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না।

এই রাজবংশের ষষ্ঠ নৃপতি প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বর শিবের জন্য সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সপ্তম নরপতি মোদনারায়ণ এই মন্দিরের কাজ সুসম্পন্ন করেন এবং ৪৪টি তালুক দেবত্র সম্পত্তি বলে দান করেন, একটি দানছত্রও খোলেন।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে বাস কালে একটি কালী মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহারাজের মৃত্যু হলে শিবেন্দ্রনারায়ণ পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন। পাশেই বড় অন্নছত্র খোলা হয়। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রীরাধারমণের কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান আসামের হয়গ্রীব মাধব মন্দির কোচবিহার রাজাদের তৈরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের মত বিখ্যাত মন্দির এখানে না থাকলেও উল্লিখিত মন্দিরগুলি কোচবিহারের জনজীবনের ধর্মীয় রূপরেখার সার্থক পরিচয় বহন করে।

কোচবিহারের কাত্যায়নী ব্রতের গান

॥ ১ ॥

রাম বল হরি বল ভাই মুকুন্দ মুরারী
পাপ তাপ দূরে যাবে বল হরি হরি
জয় জয় দুর্গে দুর্গতি নাশিনী
কাত্যায়নী দুর্গে॥
রাম বল হরি বল ভাই এই বারে বার
ওরে মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর
জয় জয় দুর্গে দুর্গতি নাশিনী
কাত্যায়নী দুর্গে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে কত না ব্রতকথা, কাহিনী। কোচবিহারের মেয়েদের ব্রতকথা আপন বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। এই বিলীয়মান ব্রতকথার উৎস-সন্ধানের যাত্রা-পথে প্রথম পাথেয় কাত্যায়নী ব্রত।

এক সময়ে এই ব্রত ছিল বহুল প্রচলিত। "ব্রত" বললেই বুঝাতো কাত্যায়নী ব্রতের কথা। রাস পূর্ণিমার সময় এই ব্রত পালিত হয়। "মুকর" তৈরী করা এই ব্রতের এক বড় বৈশিষ্ট্য। বিসলং অথবা ময়না গাছের ডাল কেটে ১½ × ১½ হাত পিড়ামিড আকারের মঞ্জুষা (ঘর) বানানো হয়। মঞ্জুষার মাথায় মোচার চূড়া, থাক থাক কারুকার্য করা কলার খোলের আচ্ছাদন থাকে। মঞ্জুষার ভিতরে প্রদীপ বসানোর জায়গা থাকে। পূজার জায়গা শোলার পাখী, ফুল ঝাড় ইত্যাদি দিয়ে সুদৃশ্য করা হয়। সহজ সরল এই অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই নিমন্ত্রিত হয়। যে কোন মেয়েই গান গাইতে পারে। বাতাসা, রাঙ্গা আলু, পানিফল, কেশর, সন্তোরা ইত্যাদি সহজলভ্য ফল পূজোয় দেয়া হয়। সুপাত্র

লাভের জন্য পিতা-মাতার উদ্যোগে সাত বৎসর হলেই মেয়েরা এই ব্রত পালন শুরু করে। এই ব্রত তিন বা পাঁচ বৎসরের জন্য করতে হয়। সন্ধ্যা রাতে জল ভরা, সুকর সাজানোর গান হয়, শেষ রাতে হয় শিবের বিয়া বিষয়ক লোকসংগীত। ভাগবতের দশম স্কন্দে কাত্যায়নী ব্রতকথার পরিচয় আছে।

কোচবিহারের এই ব্রত এই কারণেই স্মরণীয় যে, এগুলো লোকসংগীতের লৌকিক রসে নতুন জগৎ সৃষ্টি করে, যেখানে দেবতা আর মানুষের প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায়।

॥ ২ ॥

ব্রতীরা গৌরীর ঘট নিয়ে জল ভরতে যায় আর সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে :

উঠ উঠ বাস্কুম পানি তুলিবার যাই
বেলা নাই আরো পানি তুলিবার যাই ॥
উঠ উঠ বড় বৌ পানি তোল আসি
আই মাও মুই কাঁচা পোয়াতী
কেমনে উঠিম দোভাগ রাতি ॥
উঠ উঠ মেঝ বৌ পানি তোল আসি
আই মাও মুই ভর যুবতী
কেমনে উঠিম দোভাগ রাতি ॥
উঠ উঠ ছোট বৌ পানি তোল আসি
আই মাও মুই শিশুমতি
কেমনে উঠিম দোভাগ রাতি ॥
আগৎ ছাতি পাছৎ ছাতি
পানি তুলিবার যাইও রাতি ॥
পানি তুলিতে হেঁয়ালি বয়

গাছের ছেঁয়া দেকি ডরায়
গাছের ছেঁয়া তুই মোর সাথী
পানি তুলিতে যাইও রাতি ॥
এই বত্তক লাগিয়া পানি তুলিম মুই
এই বত্ত করিলে কি কি পাই
সুখে সম্পদে দিন কাটাই ॥

মেয়েরা ঘাটে এসে পৌঁছায়— এবার চলে জল তোলার স্থান নির্বাচন :

ইটা চন্দন খান পিশনু পাটে
বত্তি পানি তুলিবে কোন্ কোন্ ঘাটে
ওয়ো ঘাটে মুই না তোলং পানি
মাছুয়ায় যে মাছ ধুচে মাছ ধোয়া পানি ॥
ইটা চন্দন খান পিশনু পাটে
বত্তি পানি তুলিবে কোন্ কোন্ ঘাটে
ওয়ো ঘাটে মুই না তোলং পানি
ধোপায় যে কাপড় ধুচে কাপড় ধোয়া পানি ॥
ইটা চন্দন খান পিশনু পাটে
বত্তি পানি তুলিবে কোন্ কোন্ ঘাটে
বত্তি পানি তুলিবে পুব ঘাটে
ওয়ো ঘাটে মুই তুলিম পানি
বামনে যে শালগ্রাম ধোয়াচে শালগ্রাম ধোয়া পানি ॥

এইবার পূজা-স্থানে সুকর দিয়ে যাওয়া হয় ও বসুমতির নিকট ভূমি প্রার্থনা :

উঠ উঠ সাজো আইয়ো পূজাক লাগি যাই
বসুমতী আই আজি সুকর থুবার মাগং ঠাই।

চন্দ্র আবাহন :

চন্দ্র আগো বারোং
মুই সেন্দুর পেন্দোং

মুই হং চন্দ্রের সুয়া
একে না দৃষ্টে চন্দ্র আগো বারং
না হউক বিহুয়া যোগা।
(গান সহযোগে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়)

এদিকে পূজার জায়গাটাও ফুলে, ফলে, শোলার পাখী দিয়ে সাজানো হয়েছে :

আকাশে উড়াইল চকচকিয়া
পাতালে উড়াইল টুনি
চাঁপা নাকেশ্বর দুই ফুল ফুটিচে
গোস্বাই আসিবেন শুনি।
আসেন তো গোস্বাই আম তলে
বসেন তো গোস্বাই জাম তলে
গোস্বাই আসিলে মুই কি করিম্
অষ্ট দুর্বা দিয়া আগ বা'রম॥

মায়ের আবাহন :

সন্ধ্যাকালে সাঁজো আই আবাহন করি তোক্
মোর ঘরে পূজা নিয়া ধন্য ধন্য করো মোক্।
সন্ধ্যাকালে সাঁজো আই আবাহন করি তোক্
সাজ রাইতে পূজা নিয়া ধন্য ধন্য করো মোক্।
সন্ধ্যাকালে সাঁজো আই আবাহন করি তোক্
ভোর রাইতে পূজা নিয়া ধন্য ধন্য করো মোক্।

মায়ের উপস্থিতি :

আই সাঁজো আসিলেক্ খোল পটুয়ার ছায়
সাঁজের বেলায় আসিল মাও মোর আঙ্গিনায়।
সাঁজো আসিলেক্ আমি কি করি
জোড় হাতে সাঁজো আগুবারী

সাজোঁ আসিলেক্ ন্যেও আগুলিয়া
জড়োয়া আসোন খান সাঁজো স্থেও পাতিয়া।
সাঁজো আসিলে আর কি করিব
সুবাসিত জল দিয়া সাঁজোর চরণ ধোয়াবো।

কাত্যায়নী বন্দনা :

বন্দে কাত্যায়নী মাতা ব্রহ্মার জননী মাগো
ব্রহ্মার জননী
কি দিয়া পূজিব মাগো চরণ দু'খানি মাগো
চরণ দু'খানি।
পুষ্প দিয়া পূজিব মাগো ভ্রমরায় মধু খায় মাগো
ভ্রমরায় মধু খায়,
কি দিয়া পূজিব মাগো দেহ তার উপায় মাগো
দেহ তার উপায়।
দুগ্ধ দিয়া পূজিব মাগো বাছুরী দুগ্ধ খায় মাগো
বাছুরী দুগ্ধ খায়।

এইবার পুরোহিত মন্ত্র দ্বারা কাত্যায়নী পূজা করান। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুমের আবেশ আসে নেমে। তাদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ব্রতীগণ হাটু জোড় করে বসে বর প্রার্থনা করে কাত্যায়নী দেবীর কাছে :

১। বত্তি লোকে বর মাগে হাটু জোড় করি
এ না বত্ত করিলে কে না বর পাই
বাপ মাও বান্ধব তাকে পাই।
এ না বত্ত করিলে কে না বর পাই
শ্বশুর শাশুড়ী তাকে পাই
শুকে সম্পদে কাল কাঁটাই॥
২। বত্তি লোকে বর মাগে হাটু জোড় করি
ধনে ধান্যে ভরিয়া গেল কুলা

তাতে উদগতি পদ্ম ফুলা
পদ্ম ফুলা গৌরী দিয়া যাও বর
আর বর না মাগো সাজো আয়ো
বাপ মার বর মাগোং অক্ষয় অমর ॥

এইভাবে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়।

॥ ৩ ॥

এবার শুরু হয় হরগৌরীর বিবাহ সম্পর্কিত গান। বিচিত্র সুরে বিভিন্ন রসের সংগীতাঞ্জলীর ভিতর দিয়ে শিব-বিবাহের কাহিনী গীত হয় প্রায় সমস্ত রাত ধরে। এই সমস্ত গান মেয়েদের মুখে মুখে রচিত— তাঁদের আশা-আকাঙ্খা, করুণ-বাৎসল্য, রঙ্গ-রসের মিশ্রণে এক আদরণীয় লোকসংগীত সম্ভার।

আট বছরের গৌরীদানের প্রথা ছিল এক সময়ে। তাই মেনকা গৌরী সাতে পা দেবার সাথে সাথেই উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে শুরু করেন :

এক কল গারিল ছায়ে বায়ে তাক খায়া গেইল মইষে
গৌরীর বিয়াও দিমু কোন কোন দেশে
গৌরীর বিয়াও দিমু পূব দেশে
পূব দেশে আছে নেংটিয়া শিব তাক দিমু গৌরীক
না দিম না দিম গৌরীক নেংটিয়া শিবের ঘরে।
এক কল গারিল ছায়ে বায়ে তাক খায়া গেইল মইষে
গৌরীর বিয়াও দিমু কোন কোন দেশে
গৌরীর বিয়াও দিমু উত্তর দেশে
উত্তর দেশে আছে শিবশঙ্কর
তাক্ দিম আমার গৌরীক
সুখে করিবে ঘর।

বুড়া শিব আর কত কাল বিয়ে না করে থাকবে। তার তো স্বজন-

বান্ধব নেই কে দেবে তার বিয়া। শিবের চেলা-চামুণ্ডাগণ চিন্তিত হয়:

শিবের চেলা-চামুণ্ডাগণ
রহে বিরস বদন
শিবের বিয়াও যদি নাহি হয়
না হবে শুক শান্তি এ জগতে
কেমনে হবে মহাদেবের বিয়া রে।
তখন নারদ—
উমামন্ত্রে জাগায়ে মহাদেবে কয়।
শুন শুন মহাশয়
কালি হবে তোমার বিয়াও
জানহ নিশ্চয়।

শিবেরে জাগেয়া নারদ ত্রিভুবনে চলে
উপনীত হইল গিয়া পর্বত হিমাচলে—
শুন শুন গিরিরাজ যোগ্য পাত্রে কর কইনা দান
কে হবে মোর কইনার পাত্র কাক করিব দান
কৈলাস পর্বতে আছেন শিবশঙ্কর
তায় কইনার যোগ্য পাত্র তাক কর দান।
কহ কহ মহামুনি কেমনে পাইব
আমি শঙ্কর মুনি।
জপ মাত্র পাবে শিব শুন গিরিরাজ
যোগ্য পাত্র মহাদেব কর কন্যা দান।

শুভ কাজে বিলম্ব নয়। কালই শিবের বিয়া। সর্বত্র সাজ সাজ রব পড়ে যায়:

ওপারেতে জৈন্তীফুল গন্ধে মৌ মৌ করে
তার তলে বসি সদাশিব হাতী সাজন করে
হাতী সাজে থরে থরে

আর সাজে পাটোয়ারে
ও জয় জয় শিবের বিয়াও সাজন হয়
যায় শিব বিয়াও করিবারে ॥

নারদ মুনি বিবাদ ফণী। সে আগেভাগেই মেনকাকে শিবের অবস্থা সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিয়ে দেয়। তারপর শিবের বরযাত্রীগণ যখন এসে উপস্থিত হয় তখন মা মেনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। কেননা—

ভূত প্রেত প্যাস্তানি শিবের বরযাত্রীগুলা
সগাঁয় আসি গিসিা সোঁদাইল কানা-ভেঙ্গুর-মুলা।

মেনকা কেঁদে আকুল। মেয়েকে এর চেয়ে জলে ভাসানো অনেক অনেক ভাল।

মেনকা কাঁদিয়া কয় শুন প্রভু মহাশয়
এ হেন বরে না দিমু গৌরীর বিয়াও রে
না দিমু না দিমু গৌরীক এ বছরে
পর বছর দিমু গৌরীক রাজার কুমারে।
হাত পা বান্দিয়া গৌরাইক
ফেলাইম গঙ্গা জলে
তবু না দিম গৌরাইক নেংটিয়া শিবের ঘরে
বুড়া শিব তুই ফিরিয়া যাবু ঘরে।

এয়োগণ বরতে এলো শিবকে। কিন্তু একি! বর শিব শিঙ্গা বাজাচ্ছে, পরণে তার বাঘ ছাল, সাপ দিয়ে বাঁধা, সাপ কণ্ঠভূষণ। বরকে চন্দনের ফোঁটা দিতে গেলে সাপ ছোবল মারতে এল; এ কেমন বর—?

বরও নোয়ায় ঠরও নোয়ায়
বাদিয়ারের পো
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছো।

এয়োগণও কম যায় না। সাপ তাড়ানোর ঔষধ তাদের জানা :

কইনার ঘরের বৈরাতী কিবা গুণ জানে
চাঁদো ভাদো ঈশোর মূল খোপাৎ গুজিয়া আনে।
পাইয়া ঔষধের গন্ধ পালায় ভুজঙ্গ
সভার মধ্যেতে শিব হইল উলঙ্গ।

শিবের রাগ হল। শিবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সব কিছুই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। মা মেনকা কাঁদতে লাগলেন :

চূড়ার বস্তাত দিয়া হাত
তুষে ভরিল তাত
ও হরি হর কি দিয়া গৌরীক
বিয়া দিম।
দৈয়ের ভাণ্ডত দিয়া হাত
কাদায় ভরিল তাত
ও হরি হর কি দিয়া গৌরীক
বিয়া দিম।
চিনির বস্তাত দিয়া হাত
বালায় ভরিল তাত
ও হরি হর কি দিয়া গৌরীক
বিয়া দিম।
কাপড়ের ট্যাপরাৎ দিয়া হাত
থ্যাতায় ভরিল তাত
ও হরি হর কি দিয়া গৌরীক
বিয়া দিম।

মা মেনকার এই অবস্থা দেখে উমা শিবকে অনুরোধ করছেন হাঙ্গরমুখো জানালা দিয়ে—

হাঙ্গরোত মুখ দিয়া গৌরী বুঝায়
কি রূপ ধরিছেন প্রভু জননী ডরায়
এই রূপ ছাড় প্রভু নিজ রূপ ধর

তবে সেনে হবেন প্রভু ঋষির ঘরের বর।
কর্ণ পাতি গৌরীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন
দেখিতে দেখিতে হইলেন ভুবন মোহন।

বিয়ের কাজ শুরু হয়ঃ

হর গৌরী বিয়াত বইসে সূর্য ধরে ছাতি।
হর গৌরী বিয়াত বইসে চন্দ্র জ্বালায় বাতি॥
আরো যত দেবগণ বৈসে সারে সার।
ভূত-প্রেত-নরগণে আনন্দ অপার॥
হর গৌরী বিয়াত বৈসে মিতর ধরির
কাহো না আইসে।
শিব ডাকেয়া কয় অন্ধ আতুর যেবা হয়
পাপি তাপি মিতর ধরেন আসি।
গিরিরাজ ডাকেয়া কয় কায় আছেন পুরাইত্
নাম-গোত্র কন আসি।

স্বয়ম্ভু শিবের কে বা পিতা কে বা মাতা, সোদর-বান্ধব কোথায়? কোথায় বা পুরোহিত?

মনে মনে হাসি শিব উর্দ্ধ করিল দৃষ্টি
আকাশেতে দেবগণ করে পুষ্প বৃষ্টি।
হর গৌরী বিয়াতে বৈসে
আপনি ব্রহ্মা বিধি ধরি আইসে।
হর গৌরী বিয়াতে বৈসে
গরুড় বাহনে বিষ্ণু আইসে।

স্বয়ং ব্রহ্মা শিবের গোত্র পরিচয় দিলেনঃ

বন্দ্যবংশে জন্ম শিবের বন্দ্যবংশ খ্যাত
বন্দ্যবংশে জন্ম তার বন্দ্যবংশ জাত

গিরিরাজ গৌরী সম্প্রদান করলেন। শিব-শক্তির মিলন হল। স্বর্গে-মর্তে আনন্দের বান ডাকলঃ

আনন্দে বিহ্বল ভোলানাথ গৌরী সনে বসিছে।
"বামেতে শোভিছে ভুবন মাতা
সে যে কি রূপ তার কি কব কথা
যেন রজতাচলে হেমলতা
জড়ায়ে যেন জ্বলিছে।"

বাঙ্গালীর প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিব ও শঙ্করী পাশা খেলতে বসলেন। শিবের পরাভব সকলের আনন্দের কারণ হল:

হর গৌরী খেলায় পাশা আজিকার রাতি
কে হারে কেবা জেতে ব্রহ্মা রইলেন সাক্ষী
হারিল শঙ্কর শিব জিতিলেন গৌরী
নিজে বাঁধা রইলেন আজি শঙ্কর দুয়ারী
তা দেখি হাসে যত গৌরীর কিঙ্করী।

দান-যৌতুককে কেন্দ্র করে ব্রতীগণ লৌকিক রসের উচ্ছলতায় মেতে ওঠেন। শিব তো দেবতা নন্ যেন তাদের ঘরেরই প্রিয় আত্মীয়। বর হিসাবে শিবের যেন এর বেশী পাওনা থাকতে পারে না।

দান দেয় দান দেয় কইনার বাপ
মণি মুক্তা দিলেক দান নাই তার নেকা-জোকা।
দান দেয় দান দেয় কইনার মাও
ধান ধন অলংকার কতেক দিলেন দান।
দান দেয় দান দেয় কইনার জ্যাটো
একেনা গরু দিলেক নাই তার ন্যাটো।
দান দেয় দান দেয় কইনার জ্যাটাই
দান নাই যৌতুক নাই দিলেক একেটা লাটাই।

দুঃখের রাত্রি প্রভাত হয় না কিন্তু সুখের রাত্রি ক্ষণস্থায়ী। রাত ভোর হয়। মেয়ে গৌরী আজ পরের ঘরে চলে যাবে। মাতা

মেনকা কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে বুঝান কেমন করে পরের ঘর করতে হয় :

বাটায় শুকায় পান সুপারী মোর
খুটিত শুকায় চূণ
ছলাই ঝিয়োক বিয়াও দিয়ারে
মোর কলিজা হইল শূণ।
শিকা দেং পড়া দেং আই
পরম করিয়া ধর
কেমনে খাটিয়া খাবু মাও
দূরে শ্বশুর ঘর।
শ্বশুরে বলিবে মন্দ তাকেও না দিবে দ্বন্দ্ব
গালে গালে না দিবে উত্তর।
শ্বাশুড়ী বলিবে মন্দ তাকেও না দিবে দ্বন্দ্ব
গালে গালে না দিবে উত্তর।
ননদেও বলিবে মন্দ তাকেও যে দিবে দ্বন্দ্ব
গালে গালে দিবেন উত্তর।

মেনকা তাঁর বুকের ধন আসন্ন কন্যা-বিচ্ছেদ ব্যথায় মুহ্যমান। সাত বছরের মেয়ে কি করে পরের ঘর করবে? সকাল সন্ধ্যায় যে মেয়ে ক্ষুধা আর ঘুমে কাতর সেই ছোট্ট মেয়েটিকে আজ বিদায় দিতে হবে :

সাত বছরের গৌরী মোর কেমনে করিবে পরার ঘর
একে শিশুমতি না জানে কাজ-কাম রতি
সন্ধ্যা হইলে বাছা মোর নিদেরে কাতর
সকাল হইলে বাছা মোর ভোকেরে কাতর
বাছা মোর কেমনে করিবে পরার ঘর।
না শিখানু কাজ-কাম না শিখানু পড়া
হেলিতে খেলিতে গেইল এতো বেলা

কি হবে মোর গৌরীরে—
বাছা মোর কেমনে করিবে পরার ঘর।

হরগৌরীর মিলন হইল ত্রিভুবন সার
কৈলাস পর্বতে হইল আনন্দ অপার।
কৈলাস পর্বতের শোভা কে বলিতে পারে
নিত্য বৈসে শিব-পার্বতী তাহার উপরে।

এইভাবে ব্রত শেষ হয়। ব্রতীগণ পূজার ফুল, ঘট ও সুকর জলে ভাসিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয় ও গান গায়। একে বলে ঘট পাতলি ভাসা।

মধ্য নদী দিয়া যায় পাতলি ভাসিয়া
কোন ভাই আনিয়া দিতে পারে
এয়ো ভাই মোরে রে সেও ভাই মোরে রে
কোন ভাই চাঁপা ফুল পারে।
সোনার আকস্‌সি রূপার করণ্ডি
কোন ভাই চাঁপা ফুল পারে রে।
পাতলি যায় ভাসিয়া বত্তি কাঁদে ধূলায় লুটিয়া
না কাঁদিস না কাঁদিস বত্তি তুই
ফির বছর আসিম মুই।

ব্রত শেষ হলে ব্রতীগণের মনে এই প্রার্থনাই ফিরে ফিরে আসে— মা দুর্গা যেন ধনে-ধান্যে পতি-পুত্রের তাঁর ছোট্ট সংসারটিকে সুখে স্বাচ্ছন্দে ভরিয়ে দেন :

সাত বছর ধরি দুর্গা দেবী
আরাধন তোমাকে
ধনে-ধান্যে দুর্গা দেবী
বাড়ান আমাকে।
সাত বছর ধরি দুর্গা দেবী
আরাধন তোমাকে

ধনে-ধান্যে দুর্গা দেবী
বাড়ান আমাকে। *

* আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই ৺ধরণীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়কে। শ্রদ্ধা জানাই টাকাগাছ নিবাসী শ্রীমতী শ্যামা দেবীকে ও খাগড়াবাড়ী নিবাসী শ্রীমতী অরুণা চক্রবর্তীকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য।

লোককবি নিবারণ পণ্ডিত ও তাঁর কবিতা

নিবারণ বাবু যখন থামলেন তখন রাত্রি শেষ হতে চলেছে। আমি তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললাম। কিন্তু লোকপ্রিয় এই লোক-কবির অতীত জীবন কথা আমাকে রবীন্দ্রনাথের দুইটি পংক্তিকে বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগল :

"শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্ব ভুবন মাঝে।
অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।"

নিবারণ পণ্ডিতের জারি, ভাওয়াইয়া, ছড়া তো অশান্তিরই ফসল— রক্তে ফোটানো গোলাপ। শিলিগুড়ির সেই রাত আমার স্মরণে থাকবে। রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের প্রস্তুতি কমিটির সভায় কোচবিহার থেকে আমি আর নিবারণ পণ্ডিত গিয়েছিলাম আর সব বন্ধুদের সাথেই। নিবারণ বাবু অসুস্থ বলে ডাক বাংলোতে আমার সঙ্গেই ছিলেন। এই সুযোগে তাঁর কাছে আমার অনেক জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হল। কবি সমস্ত রাত ধরে কথা বলে গেলেন— সে কথা কখনো তাঁর জীবন-সংগ্রামের, কখনো কবিতার জন্মের, কখনো বা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার। কথা শুনে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলাম এই জন্য যে নিবারণ বাবুকে দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। সুখ-দুঃখের কথা তিনি একই ভাবে সহজ সংকোচের সঙ্গে মৃদু ভাষণে বলতে পারতেন। তাঁর এই আচরণ যেন কোন ত্যাগী মানুষেই করতে পারেন— এই উদারতা ও সহজ সারল্য তাঁর কাব্য-কবিতায় সহজ-লভ্য। নিবারণ বাবু জানালেন—

১৯১২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমার জন্ম। জেলা ময়মনসিংহ, মহকুমা কিশোরগঞ্জ, গ্রাম সগড়া। আমাদের পরিবার কৃষি নির্ভর ছিল তবে আমার বাবা ৺ভগবানচন্দ্র পণ্ডিত তাঁর পণ্ডিত উপাধি পেয়েছিলেন শিক্ষকতা করবার জন্য। বছর দশেক যখন

বয়স তখন বাবা মারা যান। দিন যাচ্ছিল কোন ক্রমে, কিন্তু পর পর কয়েক বছর অজন্মার ফলে আমাদের মা-বেটার সংসারও অচল-প্রায় হলো। বিড়ি বেঁধে কিছু আয়ের চেষ্টা করেছি ঐ সময়টাতে। পরে দেশত্যাগী হয়েও ঐ বিড়ি সম্বল করেছিলাম। কিশোরগঞ্জের রামানন্দ স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা আমার। কিশোর বয়সেই রথতলার জনসভায় মাঝে মাঝে যেতাম বন্ধুদের সঙ্গে। ছোট বেলাতেই আমি 'গ্রাম্যগান' কবিতা রচনা করতে পারতাম বলে গায়ক ও বাদকরা আমাকে দলে নিয়ে যেতেন। আর এই নিয়ে মার সঙ্গে ছিল তাঁদের নিত্য বিবাদ। মার ধারণা ছিল গায়কদের বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। মার এই ধারণা সত্যে পরিণত হয় নি বরং এই গানই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গান লেখার 'বাতিক' এক-এক সময় এত তীব্র হতো যে সমস্ত রাত ঘুম হতো না— অসহ্য যন্ত্রণা যেন কী একটা। হাতের কাছে যা পেতাম ছেড়া কাগজ, ঠোঙ্গা, খবরের কাগজ ইত্যাদি তাতেই গান বা কবিতা লিখে ফেলতাম; তাই এগুলোর অনেকই পরে বেপাত্তা হয়ে যেত। (আমি নিজে নিবারণ বাবুর বাড়ি গিয়ে কাগজের ঠোঙ্গায় লেখা কবিতা দেখে এসেছি।)

নিবারণ বাবু আরও অনেক কথা বলেছেন সে দিন— সে সব স্মৃতির মানিক হয়ে থাকবে আমার চেতনায়। কিন্তু যে জিনিষটা আমাকে অবাক করেছিল তা হচ্ছে, যাঁদের সঙ্গে তাঁর মনের মিল নেই সেই সব এক কালের বন্ধুদের প্রতি তাঁর অগাধ মমত্ববোধ। তাঁদের ভুলগুলো যখন তিনি আমাকে বলছিলেন তখন এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন যে কোন অহেতুক খোঁচা যেন না দেন তিনি বন্ধুদের। তাঁকে যত বার বলেছি আমাকে 'আপনি' বলবেন না, তত বারই তিনি 'আপনি' বলেছেন। এ মানুষকে ভাল না বেসে, শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

নিবারণ পণ্ডিতের কবিতা ও তাঁর জীবন-সংগ্রাম অভিন্ন। এই

কবিতা তাঁর আবাল্য-পোষিত স্বপ্ন; এই গান তাঁকে ঘর ছাড়িয়েছে; এই গান তাঁকে খ্যাতি ও সুনাম দিয়েছে; এই গান তাঁর ব্যক্তি-জীবনের রুটি যোগাতে সাহায্য করেছে; আবার এই গানই জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা যোগাচ্ছে—বিদ্রোহে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে তাঁর গান তাই যে কোন মহৎ শিল্পীর সম-গোত্রীয় রচনা।

নিবারণ পণ্ডিতের বাল্যকালের কবিতা-চর্চার সঙ্গে ও আর্থিক অভাব-অনটনের সঙ্গে নজরুল ইসলামের বাল্যজীবনের মিল আছে। দুখুমিঞা (নজরুল) যাত্রাগানের অথবা লেটোর দলের গান বাঁধতেন। রুটি ডলতে ডলতে গান গাইতেন। অবশ্য পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলাম গ্রাম্যগান রচনা করেন নি কিন্তু দুঃখের কঠোর স্পর্শ তাঁর কবিতাকে দিয়েছে এক বলিষ্ঠতা।

নিবারণ পণ্ডিত কোন কল্পলোকের গল্প শোনান নি আমাদের। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা যা তাঁর সমাজেরই উপজাত সামগ্রী তাকেই তিনি সবার জন্যে পরিবেশন করেছেন। কবি হবার কোন সজ্ঞান ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর কবিতা পড়ে সাধারণ মানুষ তাঁকে 'লোককবি' আখ্যা দিয়েছে। জনগণের কবি বলতে যা বোঝায় নিবারণ বাবু তাই। রবীন্দ্রনাথ কবির যে পরিচয় 'ঐকতান' কবিতায় নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে:

> "সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
> তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে
> সে অন্তরময়
> অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়
>
> *   *   *
>
> কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
> যে আছে মাটির কাছাকাছি,

সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

এই নিরীখে নিবারণ পণ্ডিতের কবিতা নিঃসন্দেহে জনগণের জন্য জনগণের সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত হবে। কৃষক সংগঠনের একজন হয়ে, গ্রামীণ মানুষের একজন হয়ে, অত্যাচারীতদের একজন হয়ে, প্রাচীন ধারায় একজন উত্তরসাধক হিসাবে নিবারণ পণ্ডিতের কবিতায় অভাবী মানুষ, ঠকে যাওয়া মানুষ, মুক্তি অভিলাষী মানুষ তার অন্তরের পরিচয় নিশ্চয়ই পাবেন।

সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির মূলে আছে 'কর্ষণ' কথাটি যা থেকে কৃষ্টি বা কালচার। চাষা আর চষা মাটি এই দুই মিলে দেশ খাঁটি। প্রাচীন অনেক সংগীতের প্রেরণাই তাই কৃষিজাত ফসল। আবার সংগীতই কৃষকের কাজের প্রেরণা।

নিবারণ বাবুর গানের বিষয়বস্তু, উপমা, অলংকার ও শ্রোতা সব কিছুই কৃষক সম্প্রদায়। হাল কৃষির সাজ-সরঞ্জাম গানের কথায় আসন পেতেছে। ব্যাপক মানুষের এই সংগীত তাই সকলেরই প্রিয় হতে পেরেছে। তাঁর গানের শেকড় তাই মাটির গভীরে প্রোথিত। এ যেন কৃষকেরই শ্রমে-ঘামে বোনা সভ্য গজিয়ে ওঠা শ্যামল ফসল। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় চীনা কৃষক-কবিদের সঙ্গে। লি-হ্‌শিওয়েন, হুয়ো-মান-সেং, লিউ-চাং প্রভৃতি কবিরা অতীত দিনের দুঃখের কথা, ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনার কথা তাঁদের গানে ধরে রেখেছেন। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন লিউ-চাং, আবার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিশ্রুতিতে ভরা কবিতাও লিখেছেন বিপ্লব পরবর্তী অধ্যায়ে :

"বাবার হাতের পাথর-ভাঙা গাঁইতি
মায়ের হাতের সেলাই করা সূঁচ
হাতে নিলাম— তারি সাথে নিলাম যে শপথ
ঐ গাঁইতি দিয়ে তৈরী হবে নতুন দিনের পথ
সূঁচে গাঁথা হবে মোদের দেশের ভবিষ্যত।"

(অনুবাদক — দিলীপ মুখোপাধ্যায়)

আর নিবারণ পণ্ডিত মুক্তির আহ্বান পাঠিয়েছেন লোকায়ত ভাওয়াইয়া গানের সুরে সুরে। লক্ষ্য করবার বিষয় হলো গানটিতে শ্রেণী চেতনা কবিতার গুণকে নষ্ট না করে তা কেমন করে বাড়িয়ে দিয়েছে। উভয় কবিরই আহ্বানের কেন্দ্রে রয়েছে শ্রমিক-কৃষক মানুষ।

"দরদী মোর ভাই
চল করি চল বাঁচিবার লড়াই
দিনে রাইতে খাটিয়া মরি— চিন্তিয়া কাটাই রাত
ওরে মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই না পাই পেটের ভাত রে॥

অমিলন নয় কোন জিনিষের— সব জিনিষই মিলে
হাট বাজারেই সব পাওয়া যায়— ডবল মূল্য দিলে রে॥
ভাগ্যবানের বোঝা দেখ্‌রে ভগবানেও বয়
গরীব চাষীর বোঝা বইবার দরদী কাঁউ নয় রে॥

ধনীর কান্দন ধনীরে কান্দে (আর) কান্দে ভগবানে
সরকার কান্দেন মায়া কান্দন— মোর কান্দন না শুনে রে॥
কাক মরিলে কাকেরে কান্দে, গুটে এক জায়গায়
গরীব মরিছে গরীব ভাই সব— আয় রে ছুটে আয় রে॥

গানের শেষের স্তবকটি আবেদনে অপ্রতিরোধ্য ও নিত্য স্মরণীয়।

নিবারণ বাবু যখন কবিতা লিখছেন তাঁর সামনে ছিল প্রচলিত লোক-সংগীতের ধারা। চন্দ্রাবতী, নয়নচাঁদ, ফকির বৈজু, দীন শরৎ প্রভৃতি পল্লীকবিদের গান তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত; এরই সঙ্গে ছিল সাঁই-দরবেশী ভাববাদী সংগীত। এই সব পল্লীগানে সুরের সমৃদ্ধি ছিল কিন্তু গায়কের বারো আনা প্রয়াস ব্যয়িত হত 'অচীন পাখী' বা অধরা তত্ত্বের সন্ধানে ! (বলা বহুল্য এই তল্লাসী সফল হতো না !)। যদিও প্রায়শই লেখকের সুখ-দুঃখের রং-এ এই সব বিশ্বাসীর স্বর্গ-সন্ধান বিম্বিত হত। নিবারণ বাবু নিজেও এই ধারার অনুকরণে কিছু গান লিখে ছিলেন; গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান—

"কৃপা করে দয়াল গৌর এস আজি এই আসরে
তুমি আসিলে আনন্দ পাব নিরানন্দ যাবে দূরে।"

অথবা কৃষ্ণ বিষয়ক গান :

"কৃষ্ণ কোথা পাইগো
বলগো ধনী কোন বা দেশে যাই।"

আবার ধর্ম বিষয়ক জারি গান :

হারে ও হানিফ চাচা মদিনাতে আয়
পরনা পাডাইছেরে তোর জয়নাল ভাতিজায়
হানিফ চাচা মদিনাতে আয়।"

কিন্তু সংগ্রামী চেতনা সম্পন্ন কবি-প্রতিভা বুঝতে বিলম্ব করে নি যে এটা ঠিক পথ নয়। জন-জীবনের প্রয়োজন মেটাতে হলে চাই নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ নতুন গান— কবিতা। কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে তা তো মানিয়ে নিতে হবে। এর আগে মুকুন্দদাস প্রভৃতি চারণ কবিরা চলতি সুরকে অবলম্বন করেই গ্রাম বাংলা মাতিয়ে তুলেছিলেন। চলতি সুরের যাদুকেই কিছু রকমফের করে সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন তিনি। সেদিনকার মানুষ "ভয় কী মরণে" এই গানটি শুনে সত্যিকারেই মৃত্যুভয়কে জয় করেছিল।

"শিল্পীদের জানতে হবে যে জনগণই সর্বদা মহান শিল্পের প্রকৃত স্রষ্টা। শিল্পের কোনও উজ্জ্বল রচনাই জনগণের ভালবাসা অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে না, এবং যদি কোনও শিল্প জমগণের স্বীকৃতি লাভ করে না থাকে, তবে তা ভাল শিল্পই নয়। আমাদের শিল্পীদের অবশ্যই জনজীবনের গভীরে ডুব দিতে হবে, এবং লোক-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য, লোক-সংগীত ইত্যাদির অনুশীলন করে তা যথেষ্ট ভাবে ব্যবহার করতে হবে তাঁর সৃষ্টি কর্মে। কিন্তু সব লোক-সংগীতই ভাল নয়, কথ্যের সব সাহিত্যই নয় ব্যবহার্য। এখানে প্রশ্ন ওঠে কোন্ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হতে আমরা চাই এবং কেমন ভাবে? অতীতের সব শিল্পের মধ্য থেকে ছেঁকে নিয়ে বিকশিত করতে হবে

শুধু সেইগুলি যা প্রকৃতই জনগণের এবং বর্জন করতে হবে যা কিছু অবৈজ্ঞানিক ও স্থূল। কিছু লোক আছেন যাঁরা মনে করেন জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করার অর্থ হল অতীতের সকল লোক-সংগীত আদি সুরে গেয়ে যাওয়া, কিন্তু তা ভুল।

ঐ ধরনের ঝোঁক আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের মৌল ধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। যা দরকার তা হলো লোক-সংগীত, সংগীত যা নৃত্যের সকল ক্ষেত্রেই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভাল অংশগুলি রক্ষা করা এবং সাথে সাথে নতুন জীবনের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ছন্দ, সুর ও গান সৃষ্টি করা, আমাদের জনগণের যে বিচিত্র শিল্পধারা রয়েছে, তাতে নতুন অধ্যায় স্থাপন করতে শেখা।" (অনুবাদ : তপেন ভট্টাচার্য) [Talk writh writeis and artists, June 30, 1951] কিম-ইল-সুঙ নির্দেশিত এই পথেরই যেন সমর্থন পাই নিবারণ বাবুর একটি চিঠিতে—"নতুন সৃষ্টি যদি কথায়, বলিষ্ঠতায়, ভাবে, ভঙ্গিতে, সুরে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় তবেই শুধু তাহা শ্রমজীবী মানুষের প্রিয় সংগীত হইবে। ঐ সংগীত জনতা ও সর্বসাধারণের মুখে মুখে ফিরিবে।" স্পষ্টতঃই বুঝা যায় নিবারণ বাবু কত সচেতন শিল্পী। শৈলী ও বিষয় সম্পর্কে সজাগ বলেই তিনি ধর্মমূলক জারি গানকে কর্মসংগীতের রূপ দিতে পেরেছেন। লোকগীতি ও কবিতায় সমকালীন ঘটনা ভিত্তিক রচনার অভাব নেই, কিন্তু ঐ সব গান একান্তই ব্যক্তি কেন্দ্রিক, কিছু ভাল লাগা মন্দ লাগার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মাত্র। গম্ভীরা, টুসু, ভাদু, বোলাস (ন) ইত্যাদি গানে কিছু সমাজ চিত্রও মিলবে, কিন্তু সে সব অনেকটাই দৈব নির্ভর হতাশার চিত্র। আবার অনেক কবি তো সরস্বতীর বরে কলম ধরেন। অমন যে বাস্তব সচেতন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তিনিও দেবতার দৈববাণী পেয়ে তবে লিখলেন—

"পোদ্দার হৈল যম টাকায় আড়াই আনা
কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।"

কিন্তু নিবারণ পণ্ডিত তাঁর সমাজকে দেখেছেন শ্রেণীদ্বন্দ্বের সত্যের

আলোকে ; তাই তাঁর কবিতায় শত্রু চিহ্নিত। কবি সুকান্ত যেমন ভাবে বলেছেন মজুতদারকে— 'ফসল ফলানো মাটিতে রোপন করবো তোকে এবার', নিবারণ বাবুও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

"কুমরণ আর মরব কত চল মরার মত মরি
বাঁচার লড়াই করি সবে, ঝাণ্ডা উঁচা করিবে দেশবাসী।"

যেখানে বেদনা সেখানেই নিবারণ পণ্ডিতের গান। এই গানে গতি সঞ্চারিত হল ১৯৩৫-৩৬সালে। সমস্ত পৃথিবীতে তখন তোলপাড় চলছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় আর্থিক সংকট, ফ্যাসীবাদের অভ্যুদয়, চীনের মুক্তি সংগ্রাম, আমাদের দেশের আপোষকামী নেতৃত্বের হতাশা সূচিত হল। ময়মনসিংহ জেলায় কৃষক আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করলো। এই সময় ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভার পত্তন হল। নিবারণ বাবু কৃষক সভার সঙ্গে যুক্ত হলেন। কৃষকদের জীবন ও সমস্যা তাঁর জারি গানের বিষয়বস্তু হল। নেত্রকোণায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে নিবারণ বাবুর জারি গান গেয়ে শুনালেন কৃষক শিল্পীরা :

কপালের দুঃখ ঘুচাব কত দিনে রে
হায় দুঃখ সয় না প্রাণে রে।
হায় হায় রে বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া
চৈতন্য হইল শেষে সংকটে পড়িয়া
অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া রোগে অনাহারে
মরেছে যখন মা বোন শিশু হাজারে হাজারে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায় রে সংকটে পড়িয়া তখন হিন্দু মুস্লীম যত
গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু হইল মিলিত
খাদ্য দাও বলিয়া দেশে চললো আন্দোলন।

এই আন্দোলনের ফলে যে ব্যবস্থা সরকার করলো তা স্বজন-পোষণ আর দুর্নীতির নামান্তর মাত্র।

হায় হায় রে তারপরে চাপে পড়ে বুদ্ধিমান সরকার
মিটাইতেছি দাবী কিঞ্চিৎ করিল স্বীকার
ঘুষখোর আর চোরাদের সামিলে রাখিয়া
ছালার মুখ বান্ধিয়া ঢালে উভুত করিয়া
(হলো) "দেড় ছটাক" কণ্ট্রোলের দোফায় গরীব বাঁচিবার
শাহীদার হইল যত প্রেসিডেণ্ট মেম্বার রে
হায় দুঃখ সয় না প্রাণে রে।
হায় রে মুখ চিনিয়া বিলি হইল কণ্ট্রোলের কুইনাইন
ট্যাক্স নাই যার কার্ড পাইল না শাহীদারের আইন
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উষার
কেউ পায় না ছিড়া তেনা কেউ করে বাহার রে
হায় দুঃখ সয় না প্রাণে রে।

শাহীদারদের কৃপায় যখন কেউ কেউ বাহার করে বালিশের বহর বাড়াচ্ছে তখন খাদ্য ও বস্ত্র সংকটের এক বিরাট হতাশা চলছে পূর্ববঙ্গ জুড়ে। মজুতদার আর কালোবাজারীরা এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করেছে। নিবারণ বাবু এই সব দুর্নীতির বিরুদ্ধেও গান লিখেছেন—

ভাব কি চমৎকার গো দেশের ভাব কি চমৎকার।
চোরেরা খায় মণ্ডা মিঠাই সাধু করে হাহাকার।
হিন্দুর বিধবা নারী পরুক কণ্ট্রোলের শাড়ী
কর‍্যাছেন হুকুম জারী এই দেশের সরকার।
বসন ভূষণ নাই বুঝিরে লজ্জা ঢাকিবার
এই দেশটারে লুট্যা খাইল ঘুষখোর আর মজুতদার
সুখ হবে না মর‍্যা গিয়া হবে না অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
লুকাইয়াছে কাপড় নিয়া যত মজুতদার
বল দাকুন কাফুন কাপড় ছাড়া কোন দেশে হয় কার
এই ভাবে কি সেই বাঙালী দাবী করবে সভ্যতার।

কাঁচা পয়সার দৌলতে তৈরী হল এক নীচ শ্রেণীর সামাজিক জীবের, যারা অর্থকেই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য বলে গণ্য করতে লাগলো। এই সব মানুষের চরিত্র, বেশ-বাস ভিন্ন ; ভিন্নতর তাদের আমোদ-প্রমোদ। এরা যেন সেই হুতোম প্যাঁচার নক্‌সার স্থুল রুচীর ধনী মানুষ। নিবারণ বাবু লিখলেন :

নব্য বাবুয়ানা গো—
বাবুদের নব্য বাবুয়ানা।
ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম জল আর উইলস্ মার্কা চুরুট টানা
পাইয়া যুদ্ধের বাজার কত নূতন হইল অফিসার

* * * *

হাতে ঘড়ি চশমা পরেন সিনেমার করেন আলোচনা।

এই বাবুয়ানার খরচ যোগায় কণ্ট্রোলের চিনি। সমস্ত মাসের চায়ের দাম এই নব্য বাবুকে দিতে হয় না। দোকানদার আর কালোবাজারী তো অনেকে এক কল্‌কেতে তামাক খান। তাই নব্য বাবু বলেন :

গত মাসের ঐ জিনিষটার দাম দিতে হবে না।
দেনা পাওনা নাই আর কারও চুরুট খাওয়াও আর একখানা।

ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় অঞ্চলের প্রায় ৮০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে টংক বিরোধী আন্দোলন হয় ১৯৪০-৪২ সালে। এই প্রথা অনুসারে জমিদারকে খাজনা হিসাবে টাকার বদলে ধান দিতে হত। ৮৫ তোলা থেকে ১০০ তোলায় হত এক সের। এই হিসাবে বিঘা প্রতি ৩ মন (কম পক্ষে) ধান জমিদারকে দিতে হত। অত্যাচারিত কৃষকগণ রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে শাসক শ্রেণী কৃষকদের উপর প্রবল অত্যাচার নামিয়ে আনে। এই ঘটনাকে নিয়ে নিবারণ পণ্ডিত কবিতা রচনা করেন। সে কবিতা ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এই প্রসঙ্গটি নিবারণ বাবুর একটি চিঠি থেকে তুলে ধরা যাক। চিঠি

হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে লেখা। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কিছু সমালোচনার উত্তরও পত্রটিতে আছে—সে হিসাবে এই চিঠিটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। নিবারণ বাবু লিখেছেন— "১৯৪০ সন হইতেই পাহাড় এলাকায় শাসক ও জমিদার শ্রেণীর জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ছোট-খাট সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চলিতেছিল। তখন হইতেই ময়মনসিংহ জেলার কৃষক সংগঠন একটি আদর্শস্থানীয় সংগঠন রূপে গণ্য হইত। নেতৃত্বের পুরোভাগে অসেন মণি সিং।

পাহাড়ী জাতি ও আদিবাসী লোকেরা সাধারণতঃ তাদের নিজেদের কোন মোড়ল বা প্রধানের পিছনে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত থাকিত। কমরেড মণি সিং ঐ সমস্ত পাহাড়িয়া আদিবাসী কৃষকদের ও নিম্নের হিন্দু-মুসলমান কৃষকদেরকে জমিদারী প্রথা, টংক প্রথা ও আরও বিভিন্ন জুলুমবাজী প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনকে সামনে রাখিয়া লাল ঝাণ্ডার নিচে সকলকে সমবেত করিয়াছিলেন। সেই হইতেই ময়মনসিংহ জেলার সংগ্রামী কৃষকগণ কমরেড মণি সিংকেই কৃষকদের প্রিয় নেতা রূপে স্বীকার করিয়া নেন।

পরবর্তী কালে দেশ ভাগাভাগি হওয়ার কিছু পূর্বে (মনে হয় ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে) ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যান্টিন সাহেব শুধু পুলিশ নয় বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়া সংগ্রামী কৃষকদের দুর্গ গাড়ো পাহাড় এলাকায় লেঙ্গুরা, কুমারগাতি, জিগাতলী, বহেড়াতলী ইত্যাদি বহু গ্রামে বর্বর হামলা চালায়। বহু কৃষকের বাড়ি ঘর পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সৈন্যেরা কৃষক মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। ঐ সময় বীর রমণী রাসমণি দা-এর আঘাতে একটি সৈন্যের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। অবশ্য অন্য এক সৈন্যের গুলিতে রাসমণি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। একটি গেরিলা গ্রুপ মেয়েদের সাহায্যার্থে গেরিলা কায়দায় বহুক্ষণ সৈন্যদের সাথে লড়াই চালাইয়া যায় এবং সৈন্যদের হইতে একটি রাইফেল ও একটি ষ্টেনগান দখল করে।

কৃষক সংগ্রামের এই বীরত্ব কাহিনী আমি পুঁথিপড়া ঢং-এ 'পুঁথি-পড়া' নামে একটি কাহিনী আকারে চিতক মিল, ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া আমার গানের স্কোয়াডের সফিরুদ্দিন, জহুর আলী, মহম্মদ আলী, রজব আলী, আব্দুল মুসলিম ও আরও কয়েকজনকে নিয়া পাড়ায় পাড়ায় 'পুঁথিপড়া' নামে প্রচার করিতে থাকি। পরে আমাদের শ্রেষ্ঠ গায়ক অখিল চক্রবর্তী নিজে ঐ গানটির আরও বৃদ্ধি করিয়া স্বরাজ বাজাইয়া বিভিন্ন গ্রাম্য গানের আসরে গাইতে থাকেন। তৎপরবর্তী কালে দেশ ভাগাভাগি হওয়ার পর ঐ গানের জন্যই অখিল চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হন। ঐ ১৯৪৯ সনেই হালুয়াঘাট থানার লক্ষীকুড়া গ্রামের কবিয়াল চন্দ্র সরকার (হাজং)-কে গ্রেপ্তার করিয়া পিটাইয়া হত্যা করা হয়। ধনেশ্বর পালাইয়া আসিয়া ২।৩ মাস আমার এখানে থাকেন। নেত্রকোণা সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে যে দলটি আমার লিখা জারী গানটি গাহিয়াছিল এদের বাড়ি ছিল করিমগঞ্জ থানার কিরাটন গ্রামে। ঐ গায়ক দলের কাউকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া কিরাটন গ্রামটি পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন পর আমার গানের স্কোয়াড সহ আমি গ্রেপ্তার হই। পরে আমাদের তিন জনকেই পিটাইয়া অর্ধমৃত অবস্থায় জেল হাসপাতালে পাঠান হয়।...

গাড়ো পাহাড় এলাকার হাজং বিদ্রোহের উপর আমার লিখা "পুঁথিপড়া" গানটির উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আপনি (হেমাঙ্গ বিশ্বাস) মন্তব্য করিয়াছেন যে— "শুনিলে মনে হয় যেন রাজার ভাগ্নে মণি সিং-ই বুঝি কৃষকদের উদ্ধার করিয়াছেন। প্রধান ভূমিকায় আছেন তিনিই— হাজং কৃষকেরা নয়।" ঐ গানটির মুখবন্ধের শেষ প্যারাটাও আপনার অজানা থাকিবার কথা নয়। সিলেট গণভোটের সময় আমি আমার গানের স্কোয়াডসহ সিলেট গিয়াছিলাম। সেখানে আপনার সাথে দেখা হয়। আমি সফিরুদ্দিন সহ ঐ "পুঁথিপড়া" গানটির বেশ কিছু অংশ গাহিয়া শুনাই। তারপরও আপনার হিঙ্গন জমাদার লেনের বাসায় আপনাকে ঐ গানটির বেশ কিছু অংশ লিখিয়া

দিয়া আসি। গণনাট্য পত্রিকায় আপনার লিখা প্রবন্ধেও বেশ কিছু অংশ রহিয়াছে। তবু আমি গানটির মুখবন্ধের শেষ প্যারাটি উল্লেখ করিতেছি :

"তারপর এক সভা হলো
নিয়ে হাজং কোচ ডালু যতেক কিষাণ
গাড়ো বানাই ছেলেমেয়ে হিন্দু-মুসলমান।
সবারে চিনাইল মণি হে রক্ত নিশান।"

ঐ গানটির সবটা না হইলেও, এই অংশটুকুসহ মন্তব্য করিলেও হয়তো আপনার মন্তব্যটা অন্যরকম দাঁড়াইত।

[প্রসঙ্গত বলা ভাল নিবারণ বাবুর পুঁথিপড়া কবিতাটির প্রতি এই কটাক্ষ করা হয়েছে ৭।১১।৭৬-এ শ্রীপণ্ডিতকে লেখা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি পত্রে। অথচ 'গণনাট্যে'র ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় নিবারণ পণ্ডিতের উপর লেখা একটি প্রবন্ধে শ্রীবিশ্বাস ঐ কবিতার দীর্ঘ-উদ্ধৃতি সহ সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন— "রচনায় সুরে গাঁথুনিতে বলিষ্ঠ ভাব দ্যোতনায় নিবারণ বাবুর এ গানটি তাঁর অন্যান্য গান থেকে স্বতন্ত্র।··· দুইজন কৃষক সামনে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে যায়, নিবারণ বাবু পিছনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কবিতা আউড়ে যান এবং ধুয়া ধরেন। হাজার হাজার চাষী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিরব আগ্রহে ও উত্তেজনায় শুনতো বাংলার চাষীর বীরত্ব কাহিনী।" তবে কি শ্রীবিশ্বাস চিন্তায় আর লেখায় এক নন?] আরও কথা আছে— ঐ গানটি দীর্ঘ ছিল, পাণ্ডুলিপিটি নাই, মনেও নাই। যদি কাহারো নিকট হইতে গানটির সম্পূর্ণ না হইলেও বেশী অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয় তবে হয় তো আপনার মন্তব্য মাঠে মারা যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়া গেল। অসম্পূর্ণ ভাবেই গানটির আরও কিছু অংশ আমি উদ্ধৃতি দিতেছি :

মোদের দুঃখের কথা কাহারে জানাই
বছর ভরা খাট্যা মরলাম পেটের ক্ষুধায় ভাই।
শুনরে ও ভাই কৃষক যত হিন্দু মুসলমান
অন্নদাতা হইয়া আমরা কি পাই প্রতিদান।
মেঘে ভিজ্যা রোদে পুর্‌্যা ফলাইলাম ফসল
সেই ফসলে পরের গোলা ভরিল কেবল।
কিনতে লাগে যে সব জিনিষ কিনি দশ গুণ দিয়া
আমরা গুলার ধান চাউল নিল মাথায় বাড়ি দিয়া।
লেখাপড়া শিখতে পাই না মাইয়া ছাওয়া যত
মূর্খ হইয়া পরাণ লইয়া থাকি পশুর মত।
... ...
... ...
... লাঠি সোটা লইয়া চলে লেঙ্গুরা বাজারে।

সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নেতাগণ। মণি সিং, আলতাব আলি আরও কয়েকজন। বলছেন সবাই করব লড়াই পিছু না ফিরিব। প্রাণ দিতে হয় দিব, মোরা প্রতিশোধ তার লব ইত্যাদি। গানটিতে লেঙ্গুরা বাজারের গুলি চালনার ঘটনা ও প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা ছিল।

গানটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে দমদমের কাছে লালগড় কলোনীতে কমরেড শচীন চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, জিতেন সেন, জলধর পাল ও আরও সেরপুরের বহু পুরাতন বন্ধু আছেন, এঁদের ভিতর কেহ না কেহ নিশ্চয়ই ঐ গানটি বা গানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিতে পারিবেন। আপনি সুশিক্ষিত ও লিখনি চাতুর্যে পটু ব্যক্তি। তাই গানটির একটিমাত্র প্যারা বাছাই করিয়া নিয়া ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার রচিত আরও একটি গানের কথা ও একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল এবং একটু হাসিও পাইল। ১৯৪৬ সনে কিম্বা তারও কিছু পূর্বে আমি একটি ভোটের গান লিখিয়াছিলাম। গানটি হইল—

তোমরা এবার লও চিনিয়া— তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছে কত দেশ দরদী ভোটা ভোটির গন্ধ পাইয়া।

১। শুনতে পাই হাটবাজারে এবার যত জমিদারে
টাকা পয়সা খরচ করে ভোট নিবেন কিনিয়া
খদ্দর টুপি ধরছেন কেহ কোলব্বর ছাড়িয়া।
আইতে যাইতে জিগ্যেস করেন কেমন আছেন সেলাম দিয়া।

২। কেউ কেউ লীগের নাম ধরে বলছেন লম্বা উয়াজ পড়ে
এবার ভোট দেও আমারে মুসলমান বলিয়া
আমি আছি লীগের মেম্বার সাত বছর ধরিয়া
এবারে ভোট না দিলে হিন্দু যাবে স্বরাজ লইয়া।

৩। ... ...
... ...
... ...
... ...

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগে পিঠা যায় বানরের ভাগে
এই কথাটা বহু আগে গেছে স্পষ্ট হইয়া
কত মামু আছেন দেখ দরদী সাজিয়া
কোন বেহেস্তে নিবেন তারা লালু কালুর ভোটখান নিয়া।

আমি নিশ্চয়ই উল্লিখিত গানটি আমার পার্টি বা সমিতির পক্ষের গান হিসাবেই লিখিয়াছিলাম। পথ চলাকালীন একদিন ঐ গানটি একটি মুসলিম লীগের আহূত জনসভায় গাওয়া হইতেছে শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

গানটির দুইটি প্যারা গাওয়ার পরই ঐ গানটির ২য় প্যারার শেষ লাইন "এবারে ভোট না দিলে ভাই হিন্দু যাবে স্বরাজ নিয়া"— এই লাইনটি ধরিয়া বক্তা এক জবরদস্ত হিন্দু বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়া ফেলিলেন। তারপর আর একদিন একটি কংগ্রেস আহূত মিটিং-এ ঐ গানটির ঐ দুটি প্যারা শুধু "খদ্দর টুপির" স্থলে রুশি টুপি বসাইয়া

গীত হওয়ার পর মুসলমান নবাব জমিদারগণ হ্যাট কোট ছাড়িয়া রুশি টুপি মাথায় দিয়া মৌলভী সাজিয়া এখন ভোট কুড়াইতে আসিতেছেন ইত্যাদি বলিয়া এক জবরদস্ত বক্তৃতা দেওয়া হইল। কমিউনিষ্ট পার্টির মিটিংগুলিতে গানটি সম্পূর্ণ গাওয়া হইত। আমি অবাক হইয়া ভাবিতাম, এ কি গান লিখলাম রে বাবা। বক্তাদের বিশ্লেষণ শুনে গানটির রং পরিবর্তিত হইয়া এক এক বার এক এক রূপ ধারণ করিতেছে। আবার কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি এই তিন দলই গানটি ব্যবহার করিতেছেন দেখিতেছি। সেই হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে বিশ্লেষণ করার ভাল ক্ষমতা থাকিলে বিশ্লেষণে দক্ষ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে তিলকে তাল করিতে পারেন আবার তিলকে কুমড়া বলিয়াও চালাইয়া দিতে পারেন।

আপনি আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন "সিলেট সীমান্তে একটি হাজং বাহিনীর নেতৃত্ব করিতে গিয়া আনসার বাহিনীর হাতে যখন সিলেটের সাধু দাস প্রাণ দিলেন তখন ঐ মণি সিং পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া আত্মগোপনের নাম করিয়া ঢাকায় পালাইয়া গেলেন।" আপনার এই উক্তিটিও মানিয়া নিতে পারিলাম না। ১৯৪৮-৫০ সন পর্যন্ত লাগাতর একটানা ভাবে যখন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী ও আনসার বাহিনী বর্বর আক্রমণ চালাইয়া সংগ্রামী কৃষকদের দুর্গ গাড়ো পাহাড় এলাকাটি ধ্বংস করিয়া চলিতেছিল তখন পাহাড় এলাকার সংগ্রামী কৃষকগণ গেরিলা কায়দায় ও মাঝে মাঝে মুখোমুখি প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। ঐ সংগ্রামে শত শত কৃষক কর্মী নিহত, আহত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কমরেড মণি সিং-এর নেতৃত্বে বাহিনী অধিনায়ক প্রমথ গুপ্ত ১৯১০ সন পর্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইয়া যান। পূর্ব পাকিস্তান সরকার মণি সিং-এর মাথার দাম দশ হাজার টাকা ঘোষণা করিলেও মণি সিংকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। মণি সিং ও আলতাব আলি ১৯৫০ সনের জানুয়ারী মাসে আমার বাড়িতেও কয়েকদিন ছিলেন। আমি নিজে মণি সিংকে... ইউনিয়নের

কমরেড সীতানাথের জিম্মায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। কাজেই পাহাড় এলাকায় কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালীন "মণি সিং ঢাকায় পালাইয়া গিয়াছিলেন" উক্তিটি মানিয়া নিই কি করিয়া?

যদিও আমি মণি সিং-এর বর্তমান রাজনৈতিক মতবাদের সহিত একমত নহি তথাপি আমি ১৯৫০ সনের পূর্বেকার ময়মনসিংহ জেলার কৃষক নেতা মণি সিংকে ও তাঁর নেতৃত্বে কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামকে শত-সহস্র অভিনন্দন জানাই। যদিও ময়মনসিংহ জেলার হাজং কৃষকদের বিদ্রোহ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি আমার মনে হয় তেলেঙ্গনার কৃষক সংগ্রাম বা নক্শালবাড়ীর কৃষক বিদ্রোহের চেয়ে ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের বিদ্রোহ কোন অংশে ছোট ছিল না।"

(হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে লেখা চিঠি— ২৫।১১।৭৬)

এই দীর্ঘ চিঠিতে পাঠক লক্ষ্য করবেন কী বিস্ময়কর বিশ্লেষণী শক্তিধর নিবারণ পণ্ডিত। অনুত্তেজিত অথচ ক্ষমাহীন তাঁর লেখনী কোন তথ্য-বিকৃতিকে স্বীকার করে না। ইতিহাসের সঠিক নির্দেশ যেন তাঁর জানা। এই চিঠি পড়ে তাই মনে হবে তিনি শুধু কবি নন, তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকও।

"নয়া আইন", "ষড়যন্ত্র" ইত্যাদি নাম দিয়ে নিবারণ বাবু লীগ সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রায় পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল কবিতা দু'টি। স্বভাবতঃই লীগ সরকার এ ব্যাপারে নিবারণ বাবুর উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবলে ভারতবর্ষও পড়েছিল। জাপান এই যুদ্ধে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে। চট্টগ্রামে বোমা পড়ে। এই সময় নিবারণ বাবু জাপানের এই আচরণের নিন্দা করে 'জনযুদ্ধের ডাক', 'জনযুদ্ধের ছড়া', 'জনযুদ্ধের গান' রচনা করেন। "জনযুদ্ধ" পত্রিকায় তাঁর জাপবিরোধী ছড়া ছাপা হয়। ছড়া বিক্রি হয়েছিল ৭০-৮০ হাজার। ছড়ার ইতিহাসে এটা বিক্রির সর্বকালীন রেকর্ড

বলা চলে। এই ছড়ার সেই জায়গা থেকে অল্প উদ্ধৃতি দেই, যেখানে নিবারণ বাবু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চরিত্র উদ্ঘাটন করে তীব্র কষাঘাত করেন এই সহজ সিদ্ধান্তে— জাপানীরাই ভারতের স্বরাজ আনবে।

হচ্ছে কানা ঘুষা, এক দুরাশা শুনি কারও মুখে
জাপানীরা ভারতবাসী রাখবে বড় সুখে
দিবে স্বাধীন করে,—
দিবে স্বাধীন করে ভারতেরে জাপান উপকারী
জন প্রতি আনিয়া দিবে সুন্দর সুন্দর নারী।
দিবে মটর গাড়ী বাড়ী বাড়ী জিনিষ সস্তা দামে
স্বরাজ ভরিয়া রাখবে গুদামে গুদামে।

এই অবস্থায় অনেকেই যখন বিভ্রান্ত তখন কবি সুকান্ত তখনকার দিনের ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অনাস্থা জানিয়ে লিখেছিলেন—

"ইতিহাস জানি নিরব সাক্ষী তুমি
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশ ভূমি।"

কিন্তু অনেকেই সে ঐতিহাসিক ঘটনার সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি বা বুঝেও বুঝেন নি।

নিবারণ বাবু নিরাবরণ কণ্ঠে বলেই ফেললেন—

"আসুন মুক্তি পেতে পারি যাতে যুক্তি করে যাই
চীনের আদর্শ নিয়ে রুখিয়া দাঁড়াই।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতার সঙ্গে নিবারণ বাবুর এই সময়ে পরিচয় ঘটে। গণনাট্যের অভিনেতা শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি শুনে তিনি মুগ্ধ হন। "রবীন্দ্র জন্মদিনে" এই নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। এই কবিতায় তিনি ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করেন নি। সাধারণ মানুষের অপরিসীম বেদনার কথাই কবি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে ব্যক্ত করেছেন কবিতাটিতে :

"হে কবি
তোমার সোনার মাঠে
কে কাটিবে ধান
কে গাহিবে গান
কেউ রুগ্ন শুয়ে আছে কেউ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে
কেউ ত্যজিয়াছে প্রাণ
তোমার মাঠের রাজা মরেছে কিষাণ।"

"তোমার মাঠের রাজা মরেছে কিষাণ"— এ পংক্তিটি তো কবির হৃদয় নিংড়ানো অভিব্যক্তি। এর চেয়ে অন্তরতর অভিব্যক্তি আর হতে পারে কি? এতো মহৎশিল্পীর সোনার কলমের স্বর্ণরেখা যা পাঠককে বার বার আকুল করে তুলবে। ১৯৩৮-এ কুখ্যাত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। নাৎসী বাহিনীর বর্বরতা বিশ্বকে স্তম্ভিত করলো। চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলো। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন সভ্যতার সংকট উপস্থিত। কবি প্রতিবাদে মুখর হলেন, জাপানী কবি নোগুচির চিঠির প্রতিবাদ করলেন। কবি প্রত্যাখান করলেন জাপান যাবার আমন্ত্রণ। লিখলেন :

"মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্র বাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত-বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।"

পৈশাচিক উল্লাসের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদী কণ্ঠের সঙ্গে নিবারণ বাবু গভীর ভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনের সংস্পর্শে এসে। (নিবারণ বাবু এই লেখককে সে সব কথা নিজেই বলেছেন)। বিশ্ব কবির এই মনোভাব নিয়ে লোককবি নিবারণ পণ্ডিত কবিতা বাঁধলেন। শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল এই জটিল রাজনৈতিক বিষয়টি নিতান্তই ঘরোয়া কথার বাঁধুনিতে।

পৃথিবীর একটা বিরাট সমস্যাকে দুই কবি তুলে ধরলেন— একের হাতে বাঁশী অন্যের হাতে একতারা।

এ যেন বড় নদী থেকে খাল কেটে জলধারাকে ফসলের ক্ষেতে পৌঁছে দেয়া হলো। পাঠকের অবগতির জন্য সেই বিখ্যাত কবিতাটির দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে :

শুনেন সবিশেষ ঐ সে দেশ, চেকোশ্লোভাকিয়া যার নাম
(ছিল) রাষ্ট্র মধ্যে উন্নত সে বড়ই সুঠাম।
এডওয়ার্ড বেনসের
এডওয়ার্ড বেনসের, কর্তৃত্বের পুরোভাগে থেকে
সুন্দর এক রাষ্ট্ররূপে গড়েছিল তাকে।
সুখ শান্তি ছিল
সুখ শান্তি ছিল, বাদ সাধিল প্রদেশ সুদাতেন
সুদাতেনে কিছু জার্মাণ বাস করিতেন।
তারা সংখ্যালঘু
তারা সংখ্যালঘু হয়েও তবু হিটলার প্ররোচনায়
সুদাতেনের স্বায়ত্ত শাসন দাবী অকস্মাৎ উঠায়।

হিটলারের প্ররোচনায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চেক সরকার ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে। নির্লজ্জভাবে ওরা বলে :

সুদাতেন দিয়ে দাও
সুদাতেন দিয়ে দাও, মেনে নাও স্বায়ত্ত শাসন
হিটলারের সঙ্গে থাকবে না আর দ্বন্দ্বের কারণ।

সুদাতেনের দাবী মানা হল। কিন্তু হিটলার চেক্ রাষ্ট্রটি দাবী করে বসলেন। মিঃ চেম্বারলেন প্রমুখরা মিলে চেক রাষ্ট্রটিকে হিটলারকে উপহার দিয়ে মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

চেককে বাদ রেখে
চেককে বাদ রেখে, মিউনিক্সে এক চুক্তি পত্র হলো

ইঙ্গ ফ্রান্স মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর করিল।
১৯৩৮ সন, ইঙ্গ ফ্রান্সগণ (দু জন) ২৯শে সেপ্টেম্বর
কুখ্যাত মিউনিক চুক্তি করিলেন স্বাক্ষর
খবর ছড়াইল
খবর ছড়াইল, সংবাদ এলো কবির গোচর
স্তম্ভিত হইলেন কবি দুঃখিত অন্তর।
কবি বার্তা পাঠান, বেদনা জানান এডওয়ার্ড বেনসের নামে
১৯৩৮ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর একটি টেলিগ্রামে।
ইহার সাথে সাথে
ইহার সাথে সাথে বেদনাতে কাঁদে কবি চিত্ত
রচিলেন কবিতা এক নাম প্রায়শ্চিত্ত।
ভিঃ লেনসির কাছে
ভিঃ লেনসির কাছে, দিলেন পৌঁছে বেদনার্ত হইয়া
ফ্রান্স, বৃটেনের বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ণ আখ্যা দিয়া
সে দিন হতে
সে দিন হতে, পৃথিবীতে প্রকাশিত সত্য
ফ্যাসী বিরোধী বিশ্বকবি ক্ষুব্ধ বেদনার্ত।
কথা আরও আছে
কথা আরও আছে, সবার কাছে করছি নিবেদন
কবির প্রতি জাপানীদের ফ্যাসিষ্ট আচরণ।
যখন বিপুল সৈন্য দিয়া হিটলারীরা চেকে মার্চ করে
জাপানীরা ঝাঁপাইয়া পড়ে চীনের উপরে।
(১৯৩৮ সনে) ২১ শে অক্টোবরে অস্ত্রের জোরে দুপুর বেলায়
জাপানীরা (চীন রাজধানী) ক্যানটনের পতন ঘটায়
(কবি তখন) শান্তি নিকেতনে
(কবি তখন) শান্তি নিকেতনে সংবাদ শুনে হলেন বিচলিত
চেকের পরে চীন পতনে হইলেন দুঃখিত।

হচ্ছে লোক ক্ষয়
হচ্ছে লোক ক্ষয় যেন প্রলয় পূর্বে ও পশ্চিমে
একি ষড়যন্ত্র চলছে সভ্যতার নামে।
কবি ভাবছেন বসে
কবি ভাবছেন বসে হা হুতাশে চিন্তান্বিত মন
হেন কালে জাপান হতে এক আসে আমন্ত্রণ।
জাপান যাওয়ার জন্য
জাপান যাওয়ার জন্য এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করে
রাসবিহারী বসু ডাকছেন যাইতে কবিরে।
ইয়েন বিশ হাজার
ইয়েন বিশ হাজার উপহার আছে কবিতার
কবি এলে পাওয়া যাবে তাহারও উপরে।
কবি মুচকি হেসে জানান শেষে মানিয়া বিস্ময়
গরীব দেশে জন্ম আমার লোভ করেছি জয়।
যার দুর্বলেরে হত্যা করে করতে চায় বাহার
ধিক ধিক শত ধিক কি বলিব আর।
আজি এই পর্যন্ত বলে ক্ষান্ত ছড়া দিলাম ইতি
কবি পদে সবার পদে করিয়া প্রণতি॥

নিবারণ বাবু তাঁর স্কোয়াড সহ গ্রেপ্তার হন ১৯৫০ সালের শেষের দিকে। অকথ্য অত্যাচার চলে তাঁর উপর। পরে কোন ক্রমে ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২৭ ডিসেম্বরের পর) পালিয়ে আলিপুর-দুয়ার হয়ে কোচবিহার চলে আসেন— দেশ হয়ে গেল বিদেশ।

এখানে এসে দেখলেন উদ্বাস্তু-প্রেমের আলখাল্লার নিচে গুপ্ত লোভ আর বন্ধ্যা রাজনীতির একই চিত্র। অভাবের সঙ্গে লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা লেখা চলতে লাগলো। ১৯৫১ সালের ২১শে এপ্রিল কোচবিহারের ভুখা মিছিলের উপর গুলি চালালো তখনকার শাসকদের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী। নিবারণ বাবু এই ঘটনার নিন্দা করে কংগ্রেসী শাসনের অবসান দাবী করে লিখলেন" "খাদ্যের বদলে গুলি" ঃ

হইল হতাহত অন্যায় মত এক চল্লিশ জন
পাঁচ জন হইল শহীদ যখন তখন।
কবিতা প্রথম মরে
কবিতা প্রথম মরে তার পরে সঙ্গী হইল তার
সতীশ বাদল বন্দনা আর বকুল তালুকদার।
শিশু সাত বৎসরের বকুলের হইল মরণ
ভ্রাতার সাথী হইল ভগ্নী বন্দনা তখন।
কংগ্রেসী বিধান ভাল
কংগ্রেসী বিধান ভাল আরও ভাল বিধান সরকার
পত্রিকাতে ঝুটা সংবাদ করেছেন প্রচার।

উমাচরণ চক্রবর্তী এই ছদ্ম নামে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। এই কবিতাটি সমস্ত উত্তরবঙ্গে ব্যাপক প্রচার লাভ করে ৭০/৮০ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। দেশত্যাগীর দুঃখ বর্ণনা করে নিবারণ বাবু "বাস্তুহারার মরণ কান্না" লিখেছিলেন। নীল বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে লেখেন "নীল বিদ্রোহের জারী":

হায় হায়রে কোম্পানীর আমলে নীল সাহেবগুলি এলো
নীল চাষীদের ঘড়ে আগুন জ্বালাইল
সেই আগুনে পুরে দেশটা হইল অঙ্গার
ছাড়খার হইল কত সুখের সংসার।
ভাল জমি নীল করেরা কিনিয়া লইল
জমি কিনে নীলের আবাদ আরম্ভ করিল।
চলা ফেরা করা চাষীর হইল ভীষণ দায়
যারে পায় তারে ধরে কুঠিতে আটকায়।
ময়মনসিংহ রংপুর পাবনা নাটোর যশোহর
দিনাজপুর নদীয়া মালদহ হইল অগ্রসর।
লক্ষ লক্ষ চাষী মিলে করল অঙ্গীকার
একদিনে সব নীলের কুঠি করিতে চুরমার।

"ভূমি সংস্কার", "আইনের দেওয়াল", "বাংলা মায়ের ডাক" আরও অনেক কবিতা ও গানে নিবারণ বাবু লোককবির সমাজসচেতন দৃষ্টি-ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে জনমনে তা সম্প্রসারিত করতে পেরেছেন। কবি হিসাবে এটা তাঁর বিরাট সাফল্য। তাঁর কোন গান কবিতাই "অপাঠ্য কিতাব" নয় বরং হাজার হাজার মানুষের প্রাণে-মনে সাড়া জাগাতে তা সাহায্য করেছে।

নিবারণ পণ্ডিতের "টসার কথা" কবিতাটির উল্লেখ না করে পারছি না। এই ছড়ায় যে গল্প তিনি শুনিয়েছেন তা লঘু হাসির আমদানী করে। কিন্তু কবিতার শেষে এসে পাঠক লেখকের সিদ্ধান্তে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়— যেন এতক্ষণ মিথ্যা একটা গল্পে ছেলেভোলানো হচ্ছিল আর কি। এই লঘু চালে কিন্তু নিবারণ বাবু যথা লক্ষ্যেই পৌঁছে যান। গল্পটি বলি ঃ

কালু মহাজনের কৃষক পরিবারের পাঁচটি লোকই কানে শোনে না। এক দিন কালু হালটা জুড়ে দিয়ে দেখলো তার লাঠিটি নেই। বাড়ী এসে সে বৌকে বলে— পেন্টিখানা কোথায় আছে আনি দে সকালে। বৌ ভাবলো স্বামী ভাত খেতে চাইছে। সে ভাত নিয়ে উপস্থিত হলো টসার সামনে। রেগে গেল টসা। বৌ খেল প্রহার। বৌ তখন নালিশ নিয়ে চলল শাশুড়ীর কাছে। শাশুড়ী তার সুতা কাঁটছিল। নালিশ শুনে টসা শাশুড়ী ভাবল— সুতা ভাল হয় না, আমি পারি না ভাল কাঁটিতে সুতা / বৌ ধরিবে শাশুড়ীর দোষ এটা কেমন কথা। বুড়ি নালিশ জানাল বুড়ার কাছে আর বুড়া ভাবল বুড়ি তাকে মাছ ধরবার কথা বলছে। সে মেয়ের কাছে গিয়ে চাইল মাছ রাখার খালুইটা। মেয়েও তার কানে শুনে না, সে ভাবলো বাবা বুঝি বিয়ের ব্যাপারে তার মত নিতে এসেছেন। সে বলল— হবে হোক না কেন মাঘ ফাল্গুনে তাতে আর কি / আমার মত তো বৌদিকে সেদিন বলেছি। গল্প শেষে লেখক বললেন :

টসায় বুঝে যেমন করে তেমন আপন বুঝাই সার
টসার মতন হইয়াছে মোর কংগ্রেস সরকার।
শুনে না ধীরা কথা
শুনে না ধীরা কথা দুঃখ ব্যথা কাহারে জানাই
ভূমিহীনরা ভূমি চাহিয়া ভূমি পায় নাই।
উঠেছে জমিদারী
উঠেছে জমিদারী আহা মরি শুনতে চমৎকার।—

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ব্যক্তি জীবনে নিবারণ বাবু ছিলেন উদার মানুষ। স্বার্থের ফাঁদে পা দেন নি তিনি কখনো। কিন্তু তাঁর কিছু বন্ধুবেশী সুবিধাবাদী ব্যক্তি তাঁকে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু নিবারণ বাবু সে ফাঁদে পা দেন নি। বরং সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে তিনি পিছপা হন নি। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষের সময়ে, জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে তিনি তাঁর কিছু পূর্ব পরিচিত সহকর্মীদের বিচ্যুতি লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছেন।

গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে নিবারণ বাবুর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য এক আবেদন করা হয়েছিল। মুসলিম ইনস্টিটিউটে ১৯৭৬-এর প্রথম দিকে গণনাট্যের শিল্পীরা সমবেত হয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে। অন্যদের সঙ্গে শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসও ছিলেন ঐ অনুষ্ঠানে। কিন্তু পুলিশী নির্যাতন হতে পারে বুঝে শ্রী বিশ্বাস ঐ অনুষ্ঠান থেকে চলে যান। এই ঘটনা নিবারণ বাবুকে আঘাত করে। নিবারণ বাবু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে কিছুদিন পরেই কোলকাতার এক নার্সিং হোম থেকে রুগ্ন অবস্থাতেই একটি গান লেখেন :

আমি আগ মার্কা এক জাত-বৈরাগী বুল ধরেছি ব্রজ বুলি
আমি নীল যমুনায় ডুব দিয়েছি গায় মেখেছি ব্রজ ধূলি
আমি পীত নদীতে ডুব দিয়েছি গায় মেখেছি ব্রজ ধূলি ॥

আমি কোন দলেতে নাই, আমি চাষী মজুর রাজ চাই
যে আমাকে যেথায় ডাকে সেই ডাকেই সেখানে যাই
আমি শ্রমজীবীর সুরে সুরে— ভোলা মন মন আমার
শ্রমজীবীর সুরে সুরেই নাচি গাই ছ' বাহু তুলি ॥
আমি শ্রমজীবীর কাছে যাই না, কোন লড়াইয়ে যোগ দেই না
আমি যদিও থাকি দরদালানে আমার চাষী দুঃখ সব জানা
মুক্তি লড়াই তোমরা কর আমি দেখাব রাস্তাগুলি ॥
আমার বহু গুণ রয়েছে এসো শুন বসো কাছে
ঐ মুক্তি মন্ত্র মোহন্তজী কেবল আমায় দিয়েছে
আমায় লেনিনবাদী বলতে পার— ভোলা মন মন আমার
আমায় লেনিন বাদী বলতে পার পরখ করে মোর কার্যাবলী
আমি আগ মার্কা এক জাত-বৈরাগী ॥

লোককবির সম্মান নিবারণ বাবুর পাঠক-শ্রোতারাই তাঁকে দিয়েছেন। তাঁর অনেক ছড়া, কবিতা আজ আর তাঁর মালিকানায় নেই, তা হয়ে গেছে "লোককবি"র সৃষ্ট সর্বসাধারণের সম্পত্তি। লোক কবিতা বা গান মূলে একক শিল্পীর সৃষ্টি নিঃসন্দেহে কিন্তু তা ক্রমেই জনগণের সৃষ্টি করা ফসল হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। প্রথাবদ্ধ সংজ্ঞায় নিবারণ বাবুকে যদি 'লোককবি' বলতে করো কুণ্ঠা হয় তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই নিবারণ বাবুর কোন ছড়াই ২০/৩০ হাজারের কম বিক্রি হয় নি। জনগণের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ট সে লোক-কবি নয় তো অমুকচন্দ্র বাউল হবেন 'লোককবি'! নিবারণ বাবুর কবিতায় ভাবালুতার পরিবর্তে এসেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা— এতো তাঁর যুগেরই দাবী, তাই তো তাঁর এত পাঠক, তা না হলে এতো কবিতা লেখার প্রেরণাটা কোথা থেকে আসবে?

নিবারণ বাবু আরও একধাপ এগিয়ে লোকগানের বিচিত্র সুর-সম্ভারকে গণসংগীতে প্রয়োগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে গেছেন। নিবারণ বাবুর আগে এ সম্পর্কে সজ্ঞান চেষ্টার উদাহরণ কম (হেমাঙ্গ

বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরীর কথা মনে রেখেও)।

জারীগানের সুরকে তিনি ভিন্ন পেক্ষাপটে ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। কোচবিহারে এসে এখানকার স্থানীয় ভাষা শিখে ভাওয়াইয়া শিল্পরূপকে অক্ষত রেখে তাকে গণসংগীতের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সচেতন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা চলে— "গণসংগীত সৃষ্টি করিতে হইলে গীতিকারকে শ্রমজীবী আন্দোলনকারী জনতার ভিতরে এদের সামিল থাকিয়া খুব কাছে থাকিয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ সব দিক ভাল ভাবে অনুধাবন করা দরকার। এদের ভাষা, ভাবধারা, আঙ্গিক, ঢং, ধরন, সুর ইত্যাদি ভাল ভাবে আয়ত্ব করা প্রয়োজন।" (দিলীপ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি)

নিবারণ বাবু মানুষের জন্যই তাঁদের দুঃখ-বেদনার, বিদ্রোহের-প্রতিরোধের গান বেঁধেছেন। এই গানের জন্য কষ্ট ভোগ করেছেন কিন্তু শিল্পীর সঠিক পথ থেকে কখনই বিচ্যুত হন নি। নজরুল ইসলাম 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় বলেছেন :

"প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

আর লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"হামার গান তোমরা ভাইরে সাঙ্গ ধরি নিও
সময় এলে আগুনে গান হাজার কণ্ঠে গাইও।"

নিবারণ পণ্ডিতের গান ও কবিতা বইয়ের তালিকা (আংশিক) :—

১৯৩৫-১৯৫০ পর্যন্ত	১৯৫১-১৯৭৫ সন পর্যন্ত
জনযুদ্ধের ডাক	বাস্তুহারার মরণ কান্না
জনযুদ্ধের ছড়া	খাদ্যের বদলে গুলি
জনযুদ্ধের গান	আইনের দেওয়াল
জারী গান (১ম খণ্ড)	জরিপ ও ভূমি সংস্কার

১৯৩৫-১৯৫০ পর্যন্ত	১৯৫১-১৯৭৫ সন পর্যন্ত
জারী গান (২য় খণ্ড)	নয়া আইনের ধারা (১ম খণ্ড)
শোক সংগীত	ঐ (২য় খণ্ড)
রবীন্দ্র জন্মদিনে	সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করুন
ষড়যন্ত্র	চাষীর কথা
নয়া আইন	টসার কথা
টংক প্রথার বিরুদ্ধে (পুঁথিপড়া)	চক্ষু কোথায় গেল
চট্টগ্রামে (বন্যা)	পুণ্ডিবাড়ীতে রিলিফ বিতরণ
পুনর্বাসন না নির্বাসন	বাংলা মায়ের ডাক
	বন্যা
	ভোট বৈতরণী
	রাসের মেলায় সার্কাস খেলা
	নীল বিদ্রোহ
	অথ অশ্ব মেষ সিংহ ব্যাঘ্র হংসস্য উপাখ্যানম্

সূত্র :—শ্রীসন্তোষচন্দ্র পণ্ডিত। বীরেন্দ্র দে সরকার।

"গণনাট্য" মার্চ-মে ১৯৭৫ সংখ্যা

,, জানুয়ারী ১৯৭৭ ,,

,, ,, ১৯৭৬ ,,

,, অক্টোবর ১৯৭৬ ,,

হামরা ধান ভানি আর গান করি
মহীপালের নাই জুড়ি।
আলানি তোর নজর সোজা আখ্।
আজা জনকপুরী কাশীক মিলে ছিলে
আজ্য পাট বেবাক নিলে জিনে।
হেই হড়াৎ—হুম্ দড়াৎ সড় সড়াৎ
চাল তুল্‌ছি, ধান ঢাল্‌ছি
আলানি তোর চালা সোনার হাত।

পশ্চিম দিনাজপুরের কোন অখ্যাত কবি উত্তরবঙ্গের পল্লী বালাদের এই কর্মমুখর বর্ণোজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন। পল্লী জীবনের কঠিন বাস্তবতায় নারী শুধু পুরুষের আনন্দসঙ্গীই নয়— নিত্য কর্মসঙ্গীও বটে। আসলে এ কথা তো মিথ্যে নয়— "নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল মাটি মিশে / ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।" তা ছাড়া ঘর-গৃহস্থালীর কাজে নারীর সমকক্ষ কে?··· "বঙ্গদেশে পুরুষদের কোন কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহ গঠন এবং গৃহ বিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভাল-মন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে; আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তক্‌তকে স্টিম নৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাই ভরা গাধা-বোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশীয় গৃহিণী লোক-লৌকিকতা আত্মীয়-কুটুম্বিতা— পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী নামক একটি চলৎশক্তি রহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে··· আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত।" —রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি

সর্বতো ভাবে স্বীকার না করলেও, এ কথা কে অস্বীকার করবে যে—সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

সম্ভবতঃ এই গুণের জন্যই কাব্য-সংসারেও নারী-প্রশস্তির অন্ত নেই। উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যে নারী অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা। বিচিত্র এই নারী মহিমা। কখনো সে ব্রতচারিণী যোগিণী, কখনো বা সে লাস্যময়ী গৃহবধূ, আবার কখনো বা সে ঘুমপাড়ানী কল্যাণী স্নেহময়ী মাতা। সৃজন-পালন যেন তারই হাতে। আবার 'ঢুলে পড়ি যবে বিষ হাসি হাসে রূপসী সর্বনাশী।'

আপনি যদি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হন আর থাকেন গ্রামাঞ্চলে তবে আপনি ঐ লম্বা জেম্বাপরা হাতে মালা লোকটিকে বছরে দু-একবার নিশ্চয়ই দেখেছেন। আর শুনেওছেন ওর বিচিত্র সুরে আওড়ে যাওয়া পাঁচালী :

যেবা নারী রান্ধে বাড়ে পতির আগে খায়
সাত মাস মধ্যে তার পতি মারা যায়।
যেবা নারী স্নান করে সিঁথিতে সিন্দুর দেন
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান।
দবদবায়ে হাটে নারী চোখ পাকিয়ে চায়
সেও নারী অভাগিনী। আগে পতি খায়।
পার উপর পাও থুইয়া যেবা নারী বৈসে
সাত মাসের মধ্যে তার সিঁথির সিন্দুর খসে।

স্বামী হারানোর ভয়ে গৃহবধূগণ এই সব লোক-পাঁচালী-কথা আজও মেনে চলেন। গৃহবধূর সবচেয়ে বড় ধন তাঁর স্বামী। উত্তরবঙ্গের প্রবাদে বলা হয়েছে :

"বাড়ীর শোভাংকর কলাগাছি নারিকেল
চাল্লির শোভা হইল ঝারি।
নারীর শোভাংকর সোয়ামী পরিধন
বিছিনা শোভা হইল নারী।"

জায়া ও মাতা রূপেই নারীর মহিমা সর্বাধিক। ফুল যেমন করে ফলে পরিণত হয়, প্রেয়সীও আস্তে আস্তে তার চার পাশে যে সংসার গড়ে তোলে সেখানে সে হয়ে ওঠে অভয়দাত্রী, মাতা। পুত্র কামনায়, পুত্র ও সংসারের মঙ্গল কামনায় নারীর কতই না অসাধ্য সাধন। সে ব্রত করে, উপোস দেয়, হাতে সুতো বাঁধে, পুত্র-কন্যার স্বপ্নকে সার্থক করতে সে কি না করে।

উত্তরবঙ্গের "ইতুলক্ষ্মী" ঐশ্বর্যের প্রতীক। সংসারের মঙ্গল কামনায় ব্রতী প্রার্থনা জানায়ঃ

"হা-ভাতের ভাত হয়
নির্ধনার ধন হয়
হা-পুতের পুত হয়
আকুমারীর বিয়া হয়।"

আর কি হয় না সে কথা জানা নেই। অনুরূপ আকাঙ্খার কথা শুনি কোচবিহারের প্রচলিত "ষাটৃপূজার" ব্রত কথায়। এই পূজার মন্ত্রটিতে নারী হৃদয়ের মূল কথাটি প্রকাশিত হয়েছেঃ

"পুলি কাটারি জাগো আমার কাজে লাগো
হারাইলে পাই মরলে জিয়াই
অপথে সুপথ হয়।
ভাঙ্গা নায়ের কাণ্ডারী হং
হইল সতীনির গোড়ত্ কাটং।
তুপুরি আগুন ঝাঁকে ঝাঁকে নিবুক।"

উত্তরবঙ্গের ব্রতের রমণীরা তপস্বিনী, শুদ্ধা, মঙ্গলদায়িনী গৃহলক্ষ্মী। শিশুর জগতে মায়ের স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল। সে ছেলেকে খেলায়, ভুলায়, কাঁদায়, হাসায়, আবার ঘুম পাড়ানি গানও শোনায়। মায়ের রাও পবনের বাও এমন শীতল নাই। ছড়ার মা তাই বড়ই স্নিগ্ধ, মিষ্টি মাটির গন্ধে ভরা। উত্তরবঙ্গের একটি প্রবাদে মায়ের আশীর্বাদ তাই উচ্চারিত হয়ঃ

"বাপ মার আশুবাদ
খা বাছা ঘিউ ভাত।"

মা জানে ছেলেমেয়ে থেকেই আসে জীবনের সার্থকতা—

"বেটা এ রাখে নাঁও
বেটি দেখায় গাঁও।"

ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলো এক সময়ে মেয়েদের মুখে মুখে রচিত হয়েছিল। সেই সব রূপকথার মায়েরা চিরদুঃখিনী। উত্তরবঙ্গের "মধুমালা-মদনকুমারের" গল্পের মা চোখের জল ফেলে ছেলেকে সাগরে ভাসতে দেখেন। এ যেন বুদ্ধু আর ভূতুমের মায়ের মতন অবস্থা। উত্তরবঙ্গের "ময়নামতীর" গানে আছে মাতৃ হৃদয়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এ ছাড়া "দেবী চৌধুরাণী"র কাহিনী ও "নিযাম পাগলার কথা"তে আছে নারীর অন্য এক রূপ। উত্তরবঙ্গের রূপকথার মা তাঁর ছেলেদের কানে কানে রূপধন কন্যা, বৃষকেতু চন্দ্রাবলী, হরিশ্চন্দ্র আরও কত কথা বলেন। অবাধ্য ছেলে সে সব শুনতে শুনতে ভয়ে বিস্ময়ে ঘুমায়, পাড়া জুড়ায়।

উত্তরবঙ্গের লোকগীতিতে শচীমাতার অন্তর্বেদনা মাতৃ হৃদয়ের আর্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যে মা তাঁর ছেলেকে 'বাংগালী' করে রেখেছে সেই মা ছেলেকে সন্ন্যাসে যেতে দেখলে কেঁদে আকুল হবেই :

প্রাণ কান্দে মোর কান্দেরে কলিযুগের ভাব দেখিয়া
না যান বাছারে মোর সন্ন্যাসী হয়া রে।
বাছারে, কে তোরে দিয়াছে গালি
ওরে কেনে ছাড়েন বাছা ঘর বাড়ী হে,
বাছারে, ঘরে রইল বাছা বিষ্ণু প্রিয়া রে॥

যদিও উত্তরবঙ্গের লোকমাতা জানেন— "বেটা মরুক বন্দনে। বেটি মরুক আন্দনে"—ঘরের কাজে মেয়ে আর যুদ্ধের কাজে ছেলের সার্থকতা। কিন্তু যে অভাগী মা জন্ম দেয়, লালন পালন করে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না সে তো কাঁদবেই। তাই শচীমাতার

কান্না মাতৃহৃদয়ের গোপনচারী চিরদিনের অন্তর্বেদনা।

উত্তরবঙ্গের লোকগীতিতে ও দোতরা পালায় প্রেমিকা নারীর ত্যাগের মহিমা ধন্য করেছে লোকজীবনকে। সীতা নয়, সাবিত্রী নয়, বেহুলা উত্তরবঙ্গের একান্ত কাছের মানুষ। পল্লী রমণীরা বেহুলাকেই আদর্শ বলে ধরে নিয়েছে। বিয়ের রাতে স্বামী হারানোর ব্যথা পল্লী-গীতিতে কারুণ্য সৃষ্টি করেছে। স্বামীকে জীবন্ত করার জন্য তাঁর ত্যাগ ও সংকল্প অতুলনীয় :

"হাত ধরিয়া বলং আই মুই শ্বশুর সদাগর
পঞ্চ গাচি কলা মাগং ভুরা বান্দিবার
যাব আমি পতি জিয়াইবার।"

কলার ভেলায় ভেসে যায় বেহুলা আর কান্নায় কান্নায় ভাসিয়ে দেয় তাঁর বুক :

ও মোর বিধাতা ও মোর বিধাতা
এত দুঃখ কেনে বা দিলেন বিধি রে।
যদি পতি নাহি পাব গলায় কাটারি দিব
বন্ধ দিব তোমার উপর বিধি রে।
যদি পতি নাহি পাব ফিরিয়া চম্পকে যাব
ঝম্প দিব সাগরের জলে মোর বিধি রে।

বেহুলার এই শোকাতুরা অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ অভিযানের কথা লিখেছেন উত্তরবঙ্গের কবিরা। লোকজীবনের উপাদানেই এই বেহুলা তৈরী হয়েছে। তাই বেহুলা আজ নারী জীবনের আদর্শস্থানীয়া রমণী।

রমণী ব্যক্তিজীবনে রমণীয় অভিজ্ঞতাও বটে। উত্তরবঙ্গের কবি বাঁশ বনের পাশে মাটির আঙ্গিনায় যে নারীকে প্রস্ফুটিত হতে দেখেন তার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর মনে আসে পল্লী-প্রকৃতির সহজলভ্য উপমা। কবি বলেন :

"ভরা দিঘীর মাঝে যেমন ফোটে হোলার ফুল
কন্যা রূপে ভোমরা।"

অথবা তাঁর মনে হয়—

"ইন্দ্রদেবের সচি কিবা সীতা সতী নারী
কন্যার রূপের ব্যাখ্যান কহিতে না পারি।"

নারীর গৌরব তার রূপে নয়, কাজলটানা চোখে নয়, নূত্য পরা গতিতে নয়— তার পরিচয় সে প্রেমময়ী নারী। প্রেমের মূল্যেই সে মাতা, প্রেমের মূল্যেই সে জায়া। তার প্রেমের মূল্যেই জগৎ বশ। এই প্রেম উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানে এক প্রাণমাতানো ভঙ্গিতে প্রকাশিত।

প্রথম যৌবনকালে বিয়া না হবার দায় ভগ্ন অর্থনীতির। বিদেশী সওদাগর অথবা উদ্দাম রাখালের জীবনসঙ্গী হতে চাওয়ার মাঝেও আছে সমাজজীবনে অর্থনীতির অপঘাত। পরদেশীর সাথে ঘর বাঁধতে চায় কোন এক পল্লী ললনা :

"আরে ও সলংয়া নায়ের মাঝি
কোনদিন ভাইটাবেন নৌকা আমরা যেন জানি রে।
আশা ছিল সঙ্গে যাব মাও হৈল রে বৈরী
এমন নিদারুণ পিতা হস্তে দিল দড়ি রে।"

কখনো মৈষাল-প্রেমী নারী অনুনয়ে ভেঙ্গে পরে :

"প্রাণ কান্দে মোর মইষাল বন্ধু রে
আর ভার বান্দ ভারাটিরে বান্দ মইষাল তুলিয়া বান্দ রে হাড়ি
এ হান বয়সে ছাড়িয়া যাইবেন ভর যুবতী নারী রে।"

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ মেয়েদের বিয়ের আসরে যে গান গাওয়া হয় তার সুর মূর্চ্ছনা হৃদয়কে অধিকার করে নেয়। মেয়েদের এই জগৎ কতই না ব্যথায় আন্দোলিত। বাড়ীর মেয়েরা আদরের দুলালীকে হারিয়ে কাঁদে :

সাজে মতি মোর বিয়াও না সাজে রে।
কান্দে মতি মোর বড় ঘরের মাঝে রে॥
কান্দে মতি মোর বেড়াতে হেলান দিয়া রে।
ভাবে মতি মোর ভাগ্যে কিবা আছে রে॥

কান্দে মতি মোর মারও কোলৎ বাসিয়া রে।
আনে মতিক মোর মাড়োয়ার তলে রে॥

সংসার জীবনের অনটন নারীকে ক্ষুব্ধ করে। সে কখনো বলে—"ভাত্বর বাড়ী দালান কোঠারে আমার বাড়ীৎ খেরী ঘর / ও স্বামী তোর পায়ে পড়ি ভাত্বর মতন দালান কর।" আবার কপট অভিমানে বলে—"না লাগে তোর জলটুপ নথ / না লাগে তোর নাকের ফুল / বৌদির বাদে আনিছে দাদা / কি সুন্দর ঝুম্‌কা নাগা তুল।" এই সব অভিমান স্থায়ী হয় না যখন প্রেমিক পুরুষটি বলে :

"কুচবরণ কন্যা রে তোর সোনার বরণ গাও
নয়নে কাজলের রেখা ময়নার মত করিস রাও।"

তখন কুচবরণী গেয়ে ওঠে :

"তোমার কথা মানিম বন্ধু হে, বন্ধু ছাড়িম দেশের মায়া
বাপ মাও ছাড়িম বন্ধু, তোমার দিকে চায়া বন্ধু হে।"

নারী চিরদিনই এইভাবে ঘর ছেড়েছে, ঘর বেঁধেছে। আর নারীর এই শক্তিকেই সম্বল করে পুরুষ জঙ্গল কেটে আবাদ করেছে, হালের মুঠি শক্ত করে ধরেছে। শুধু উত্তরবঙ্গে কেন সমস্ত দেশেই এই একই ইতিহাস। উত্তরবঙ্গের ভেঙ্গে পড়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণ-ধারণের গ্লানিকে জয় করে নারী শতরূপেন সংস্থিতা। এরই পরিচয় বহন করছে উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য।

প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য-শব্দ ভাণ্ডার : "ধন ধান্য" পত্রিকার ১১ বর্ষ, ২৪ সংখ্যায় মুদ্রিত।

উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও গবেষণা প্রসঙ্গে : উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক লোক উৎসব ও ওয়ার্কশপ—১৯৮০ উপলক্ষে রচিত তথ্যভিত্তিক রচনা। "নন্দন" পৌষ সংখ্যা—১৩৮৭-এ প্রকাশিত। "আকাশবাণী" শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে ২২।১২। ৮১-তে প্রচারিত।

উত্তরবঙ্গের বনশ্রী : উত্তরবঙ্গের অরণ্য-সমৃদ্ধির অন্তরঙ্গ পরিচয়। "উত্তরবঙ্গ সংবাদে" প্রকাশিত।

উত্তরবঙ্গের হেটো কবিতায় সমাজ চিত্র : "গণনাট্য" পত্রিকার ১৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত। "আকাশবাণী" কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত ধর্ম : "উত্তর দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত। "আকাশবাণী" শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে ২৮।১২।৭৮ ও ৬।৩।৭৯-এ প্রচারিত।

কোচবিহারের গ্রাম-নামে সমাজ চিত্র : "উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক লোক উৎসব ও ওয়ার্কশপ—১৯৮০" স্মরণিকায় ও "মধুপর্ণী" পত্রিকায় প্রকাশিত। "আকাশবাণী" কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতির অভিমানীরা : কিঞ্চিত পরিবর্তিত আকারে "উত্তর দর্পণে" প্রকাশিত ও "আকাশবাণী" শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

কোচবিহারের দেব দেউল : "মধুপর্ণী"-র বিশেষ সংখ্যা ১১ বর্ষ, ১৯৭৭-এ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কোচবিহারের কাত্যায়নী ব্রতের গান : "কল্যাণ" পত্রিকায় শ্রীহিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে প্রকাশিত। "আকাশবাণী" কলিকাতা কেন্দ্র থেকে ২৮।২।৭৭ ও ২০।৭।৭৭-এ প্রচারিত।

লোককবি নিবারণ পণ্ডিত ও তাঁর কবিতা : কবির সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সূত্রে লেখাটির জন্ম। "গণনাট্য" পত্রিকায় প্রকাশিত।

উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যে নারী : "আকাশবাণী" শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে ৯।৬।৮১ ও ১৪।৭।৮১-এ প্রচারিত।